আবছায়া

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

পি, কে, বসু য়্যাণ্ড কোং
কলি-৩১

—এগারো সিকা—

প্রচ্ছদপট :

অঙ্কণ : আশু বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্লক ও মুদ্রণ : ভারত ফটোটাইপ স্টুডিও

পি, কে, বসু এন্ড কোং, কলি-৩১, ঢাকুরিয়া হইতে শ্রীপ্রফুল্লকুমার বসু কর্তৃক প্রকাশিত ও ৮৬এ, লোয়ার সার্কুলার রোড লোক-সেবা প্রেস হইতে শ্রীসুখলাল চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত।

উৎসর্গ

স্বর্গগত হরিদাস পালের

স্মৃতিতে—

জন্মান্তর ?

অকস্মাৎ যেন একটা কালো আর ভারী পর্দা টেনে দেওয়া হ'ল—উৎসব-বাড়ীর সেই সমস্ত লোকগুলির মুখের ওপর। সবাই একসঙ্গে চুপ ক'রে গেল এবং চুপ ক'রেই রইল কিছুকাল।

কনক একটু অপ্রস্তুত হ'ল বৈকি !

সে যেন কেমন থতমত খেয়ে—একটু অবাক্ হয়েই এর ওর মুখের দিকে চাইতে লাগল। মুখে বোকার মত এক ধরনের হাসি। অর্থাৎ অন্যায় করে ফেলেছে কিংবা অবিশ্বাস্য কিছু বলে ফেলেছে—অথবা একেবারেই তার কথা কওয়া উচিত হয়নি কিছুই স্থির করতে না পারার মাঝামাঝি একটা পন্থা। এর পর লজ্জিত হওয়া, অপরাধীর মত মাথা নিচু করা—এমন কি কৌতুক-হাস্যে ফেটে পড়াও অত্যন্ত সোজা।

অথচ প্রশ্নটা নিতান্তই সামান্য—সহজও।

সে মাকে জিজ্ঞাসা করেছে, 'মা, কালোমত একটা মেয়েকে দেখলুম সিঁড়ির নিচের ঘরটা থেকে বেরিয়ে তোমার ভাঁড়ার ঘরের দিকে চলে যেতে—ও কে ? কৈ ওকে ত কখনও দেখিনি !'

তাতে এই রকম যে একটা ভয়াবহ স্তব্ধতা নেমে আসবে গোটা বাড়ীর এই সমস্ত অধিবাসী ও অভ্যাগতদের মধ্যে তা সে কেমন ক'রে জানবে ?

অবশেষে অনেকক্ষণ পরে অবস্থাটা তার অসহ্য হওয়াতে সে একটু অসহিষ্ণু ভাবেই প্রশ্ন করলে, 'কী ব্যাপার, কি ? হ'ল কি তোমাদের ? আরে !'

এর পর প্রথম প্রাণ-লক্ষণ ফিরে এল ওর জ্যাঠাইমার মধ্যেই। যেন প্রাণপণে কান্না চাপবার চেষ্টা করতে করতে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে ওপরে উঠে গেলেন। অত প্রয়াস সত্ত্বেও তাঁর সেই অদম্য কান্নার একটা শব্দ কনকের কানে গিয়ে পেঁাছল। সে আরও অবাক হয়ে প্রশ্ন করলে, 'কী করলুম, কি? হ'ল কি সবাইয়ের!'

বিশেষত জ্যাঠাইমার এই ভাবান্তর তাকে সব চেয়ে বিচলিত করেছে। কারণ জন্মাবধি সে সবচেয়ে প্রশ্রয় পেয়ে এসেছে এই জ্যাঠাইমার কাছেই, বলতে গেলে তিনিই মানুষ করেছেন ওকে। মার চেয়েও বোধহয় এই জ্যাঠাইমা তাকে ভালবাসেন। ওর কোন কথাতে যদি তিনি আঘাত পেয়ে থাকেন ত তার চেয়ে লজ্জার কথা আর কি হ'তে পারে?

কনকের প্রশ্নেই যেন বাকী সকলে সম্বিৎ ফিরে পেলে। প্রথম প্রকৃতিস্থ হলেন ওর মামাই, বড়মামা ধমক্ দিয়ে উঠলেন সবাইকে, 'এত ভয় তোদের! অমনি ও কাকে দেখতে কাকে দেখেছে আর তোরা ধরে নিলি বাড়ীতে চোর ঢুকেছে! যত্ত সব ইয়ে হয়েছে।'

ইঙ্গিতটা বুঝে নিলে সবাই চোখের নিমেষে।

আবার কর্ম্ম-কোলাহল উঠল, হাস্য-পরিহাসে মুখর হয়ে উঠল সারা বাড়ীটা যে যার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এল। ছোট মামিমা বললেন, 'তা বাপু, ভয় হয় বৈকি! এই কাজের বাড়ী, একটা অজানা আন্‌টো লোক ঢুকলে কত কি মেরে নিয়ে চলে যাবে—কেউ টেরও পাবে না।'

অর্থাৎ চোরের ভয়টাই যেন প্রধান।

কনক বলে উঠল, 'ওমা কালোমত মেয়ে একটা দেখলুম

হয়ত পনেরো ষোল বছর বয়স হবে বড় জোর, সে চুরি করবে ?'

মামিমা বললেন, 'হ্যাঁ অম্নি-সব মেয়েদেরই ত ছেড়ে দেয়, তাহ'লে আর কেউ সন্দ করবে না। বুঝলি না ? এমন যে ঢের দেখা আছে আমাদের। তাইত সবাই অত ভয় পেয়ে গিয়েছিলুম।'

তবু একটা সংশয় যেন কনকের মন থেকে যেতে চায় না কিছুতেই। সে বললে, 'তা জ্যাঠাইমা অমন কেঁদে উঠলেন কেন ?'

বড় মামা গলা নামিয়ে বললেন, 'সে অন্য ব্যাপার। ওঁর বড় ছেলে মানে তোর বড়দা—বেঁচে থাকলে বড়দাই বলতিস্, মারা গেছেন না ! আজ উৎসবের দিনে স্বভাবতই ওঁর মনে হচ্ছে যে, যদি সে বেঁচে থাকত ত কত আনন্দ করত—আমাদেরও কত আনন্দ হ'ত—বেশ ছেলে ছিল রে !' বলতে বলতে ওঁর কণ্ঠস্বর গাঢ় হয়ে এল।

তবু কি কনকের মনে কোথায় একটা অসামঞ্জস্য ঠেকে ? কোথায় একটা সংশয়ের কাঁটা বিঁধে থাকে ?

কে জানে !

কথাটা সবাই সযত্নে এবং প্রাণপণে চেপে রাখবারই চেষ্টা করেছেন এতকাল, চেপে রেখেও ছিলেন কিন্তু আর বুঝি থাকে না।

দুপুরে আর এক কাণ্ড হ'ল।

কিন্তু তার আগে ব্যাপারটা বোধ হয় একটু খুলে বলা দরকার।

আজ কনকের দিদির বিয়ে। উনিশ বছরের মেয়ে, সেকেণ্ড ইয়ারে পড়ছিল, আর ক-টা মাস পরেই পরীক্ষা দিতে পারত কিন্তু হঠাৎ আশাতীত রকমের ভালো পাত্র প্রায় বিনা খরচে মিলে যাওয়াতে সকলে এটাকে বিধাতার যোগাযোগ বলেই ভাবলেন, তাই আই-এ পাস করার চেয়ে এমন বিবাহটাই আগে হয়ে যাওয়া ভালো সর্ব্বসম্মতিক্রমে এইটেই স্থির হ'ল। ঊর্ম্মিলা একটা ক্ষীণ আপত্তি করেছিল বটে—তবে সেটা খুব আন্তরিক নয়—কেউ তাই তেমন গুরুত্বও দেয়নি সে আপত্তিতে।

একে এই সুবাঞ্ছিত বিয়ে, তায় বাড়ীর প্রথম কাজ—অন্তত এ পুরুষের ত বটেই—তাই একটু আনন্দ উৎসবের ঘটা ছিল। কনকের জ্যাঠাইমা হেমলতার ছেলে নরেন মারা গেছে কনকেরও জন্মের এক বছর আগে, সেই জন্যেই বোধ হয় কনকের প্রতি তাঁর এত স্নেহ। তাঁর দুটি মেয়ে আছে, তবে তারা ঊর্ম্মিলার চেয়েও ছোট। কনকের মা নলিনীরও এই প্রথম সন্তান। সুতরাং এর আগে বিয়ে দেবার আর প্রয়োজনই হয়নি।

কাজেই নানা অসুবিধা সত্ত্বেও, আত্মীয়-স্বজন প্রায় সবাইকেই আনানো হয়েছিল। কলকাতাতে যাঁরা থাকেন তাঁদের ত কথাই নেই—এমন আন্তরিকতার সঙ্গেই সকলকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে যে কেউই না এসে থাকতে পারবেন না।

এই উপলক্ষ্যে বিজয়ারও আসবার কথা। বস্তুত নরেনের মৃত্যুর পর সে আর কোনদিনই এ বাড়ীতে আসেনি, তার নাম করাও কষ্টকর ছিল সকলের পক্ষে। এবার হেমলতাই নিজে তুলেছিলেন তার কথা। বিজয়ার বিয়ে হয়ে গেছে, ছেলেপুলের মা—তাকে বাদ দেওয়ার—এই এতকাল পরে আর কোন কারণই

থাকতে পারে না। বিশেষত সে যখন মিলির বড় মামিমার নিজের বোন। তাছাড়া সম্পর্ক খুব নিকট না হলেও, এক কালে খুবই যাওয়া আসা ছিল এ বাড়ীতে। আর—

কিন্তু সে কথা থাক্। তার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হ'লেও সে-কথাটা কেউ মুখে আনতে পারেন নি।

বিজয়া এল বেলা তিনটে নাগাদ। এতকাল পরে এতগুলি আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে দেখা হবে, কাজেই একেবারে সন্ধ্যার সময় নিমন্ত্রণ খেতে আসার মত আসবার কোন মানেই হয় না। ওর দিদির সঙ্গেও দেখা হচ্ছে অনেক দিন বাদেই...

বিজয়া অবশ্য আজও সুন্দরী আছে কিন্তু তা সত্ত্বেও বয়সের একটা ছাপ পড়েছে নিঃসন্দেহে সে মুখের ওপর। তিন চারটি ছেলেমেয়ের মা...তাকে দেখে অন্তত কিশোর-বয়সী ছেলের মনে চাঞ্চল্য জাগবার কথা নয়।

কিন্তু সহসা এ কী কাণ্ড।

বিজয়া যখন এসেছে তখন কনক তেতলায় তার নিজের ঘরে ঘুমোচ্ছিল। প্রাথমিক অভ্যর্থনার হৈ-চৈ-টা কমে যাওয়ার পর এক ফাঁকে চুপি চুপি বিজয়া দিদিকে জিজ্ঞাসা করলে, 'আচ্ছা দিদু, সে কোথায় ? কোন্‌টি এর মধ্যে ?'

মিলির বড় মামিমা একটু অবাক্ হয়েই তাকিয়ে রইলেন ওর মুখের দিকে।

'কে রে ? কার কথা বলছিস ?'

'ঐ যে...কী যে বলে কনক...না কি !'

'ও, কনক ?...সে ত এখানে নেই। হ্যাঁরে সদি, কনক কোথায় রে ?'

'দাদা ? সে ত তেতালায় ঘুমোচ্ছে...'

'সে ত ভালই। চলো না দিদু, দেখে আসি চুপি চুপি...'

'আর এখন উঠতে পারি না। সে ত নামবেই...এখনই হয় ত নিচে আসবে।'

'না না...তার চেয়ে আমিই দেখে আসছি। ঘুমোচ্ছে এখন, সেই ভালো...'

এ বাড়ীর ঘরদোর সবই বিজয়ার পরিচিত। তাই সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে এক সময়ে সে অনায়াসেই ওপরে উঠে গেল। আর অনেকক্ষণ ধরে কনকের ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে এবং সকলের অগোচরেই হয়ত নেমে আসত যদি না ফিরে আসার সময় হঠাৎ ওর পা লেগে একটা চেয়ারে শব্দ হ'ত।

কনক ঘুম ভেঙে ধড়মড়িয়ে উঠে বসল। কাজের বাড়িতে এতটা ঘুমোবার জন্য অবচেতন মনেও একটা লজ্জা ছিল বোধ হয়, তাই অত সহজে অত বেশি জেগে উঠল।

'কে ?' প্রথম স্বাভাবিক প্রশ্নের পরই কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ম হয়ে উঠল।

'তু...আপনি কে, কে বলুন ত ? আপনাকে ত কখনও দেখিনি !'

বিজয়া অপ্রতিভ হলেও পালাল না। বললে, 'আমি তোমার বড় মামিমার বোন। মাসি হই সম্পর্কে।'

'অ।...কিন্তু আপনাকে ত কখনও দেখিনি। নাম শুনেছি বটে। তা বসুন না একটু—'

অগত্যা বিজয়া বসেছিল।

একথা সেকথা—তুচ্ছ দু একটা কথার পর কনক বলে উঠল, 'আচ্ছা আপনাকে আমার এত ভাল লাগছে কেন ?

বড্ড...বড্ড ভাল লাগছে। বুকের মধ্যেটা যেন কেমন ক'রে উঠল আমার। কী যে মনে হচ্ছে। যেন কত কালের পরিচয়।...কী যে মনে হচ্ছে তা বোঝাতে পারব না।...আচ্ছা কোথাও কি দেখিনি আপনাকে এর আগে ? ঠিক ক'রে বলুন ত !'

বিজয়ার চোখে কি জল ভরে উঠেছিল ?

তা ও অমন ছুটে পালালই বা কেন ?

'কি হ'ল, শুনছেন ? শুনুন না—'

বিজয়া যেন অন্ধের মত হাতড়ে হাতড়ে, কোন মতে, ঠোক্কর খেতে খেতে ছুটে নেমে এল নিচে—

স্তম্ভিত, বিমূঢ় ভাবটা কাটাতে কনকের একটু সময় লাগল। এ আজ ওর কি হ'ল, কেবলই কি ব্যথা দিয়ে বসছে সবাইকে ! অথচ কারণটা যে কি তাও ত বুঝতে পারছে না।

একটু পরে কনকও নেমে এল।

'মা, ওমা, শুন্‌ছ ? আচ্ছা, ঐ মাসিটি কে মা—ঐ যে বড় মামিমার বোন না কে—ওঁকে কি এর আগে কোন দিন দেখিনি ? ওঁকে দেখে তবে অত চেনা-চেনা লাগছে কেন ?... মনে হচ্ছে বহুকালের পরিচয়, অনেকদিন ধরে দেখছি ওঁকে।...আর কী ভাল যে লাগল—এমন ইচ্ছে করছিল—যেন জড়িয়ে ধরে খুব খানিকটা আদর করি।...বুকের মধ্যে যেন তোলপাড় ক'রে উঠল ওঁকে দেখে—'

ওকি, আরে !

মা ডুকরে কেঁদে উঠে ছুটে চলে গেলেন কোথায় ? এ কী হ'ল ওর ? কনক কি পাগল হয়ে গেছে ? না এরাই সব পাগল হ'তে বসেছে !

এসব কী কাণ্ড ঘটছে আজকে ?

কারণ একটা ছিল বৈকি !

যে-কথাটা ও'রা চেপে রাখতে চেষ্টা করেছিলেন প্রাণপণে—সে ইতিহাসেরও আজ সতেরো বছর বয়স হ'ল বোধ হয়—কি আরও বেশি।

সে কনকেরও জন্মের বছর দেড়েক আগের ঘটনা।

নরেনের সবে একুশ বছর বয়স। অল্প বয়সে ম্যাট্রিক পাশ করেছিল বলে ঐ বয়সেই সে এম-এস-সি পরীক্ষা দিয়েছে। ভাল ছাত্র, সসম্মানেই পাস করবে নিশ্চয়। সুতরাং তার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কল্পনা করছে সবাই—আই-সি-এস পরীক্ষা দেবে কিংবা ফাইনান্স্। কেউ বলছে ভালো করে রিসার্চ করুক, ডক্টরেট্ পেলে অধ্যাপনাও করতে পারে সরকারী কলেজে।

সে সময় বিজয়াও এ বাড়ীতে আসত প্রায়ই। ষোল বছরের রূপসী মেয়ে—নরেনের ভাল লেগেছিল ওকে। বিজয়ারও মনোভাব অনুকূল।

তখন কনকের বড় মামিমার বাবা বে'চে ছিলেন, তিনি নরেনের বাবার কাছে প্রস্তাব করে বসলেন, 'বিজয়ার সঙ্গে নরেনের বিয়ে দিন, আমি নরেনকে বিলাত পাঠিয়ে মানুষ করে আনব।'

সবাই তখন সানন্দে মত দিয়েছিলেন। বয়স কম—সেটা কেউ এমন কিছু আপত্তিকর বলে মনে করেন নি। সব দিকেই যখন সুযোগ তখন ওটা এমন কিছু ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়। আগে ত এরও ঢের আগে বিয়ে হয়ে যেত।

সব ঠিকঠাক—শুধু পরীক্ষায় ফলটা বেরুলেই হয়, এমন সময় ব্যাপারটার সূত্রপাত।

একদিন সকালে উঠে নরেন উত্তেজিত ভাবে বললে, 'মা, ও কালো-মত মেয়েটা এত ভোরে কেন আমার ঘরে ঢুকেছিল বলো ত ?'

'কে কালো-মত মেয়ে রে ? কৈ কেউ ত আসেনি।'

'হ্যাঁ, আসেনি বললেই শুনব। দেখলুম আমি স্পষ্ট।'

'তুই তাহ'লে ঘুমের ঘোরে কি দেখতে কি দেখেছিস।'

'হ্যাঁ ঘুমের ঘোর বৈ কি ! বছর পনেরো-ষোলর একটা মেয়ে—নীলাম্বরী কাপড় পরা, পরিষ্কার দেখলুম ! ভালো করে দ্যাখো, কেউ চুরি টুরি ক'রে নিয়ে পালালো কিনা।'

সে ভয়টা নরেনের বাবারও হয়েছিল। কিন্তু তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজেও কোন জিনিস চুরি হয়েছে বলে জানা গেল না। সে মেয়েটারও কোন হদিশ মিলল না। কেউই দেখেনি।

এর তিন চার দিন পরে আবার।

সেটা বলতে গেলে দুপুর বেলা। বেলা চারটেও বাজেনি। নরেন ছুটতে ছুটতে ওপরে এসে হাজির—

'মা, আজ ত আর বলতে পারবে না যে ঘুমের ঘোর। এই ত সিঁড়ির নিচের ঘরটা থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল মেয়েটা—ঐ যে ঘরটাতে তোমার কাঠ ঘুঁটে থাকে, সেই ঘরটা থেকে—'

'কে রে ? কী বলছিস তুই ?'

'ঠিকই বলছি। কে আসে ভাল করে খবর নাও। ঝি চাকরদের কেউ কিনা। হয়ত তোমার হারাধন চাকরেরই কেউ—। আজ তাকে স্পষ্ট দেখেছি। কালো, নাকটা

খাঁদা—চোখের চাউনিটা যেন কেমন কেমন। মোট কথা মেয়েটা ভালো না—'

সেদিন আর উড়িয়ে দেওয়া গেল না। হৈ চৈ হ'ল খুব। সবাইকে জেরা করা হ'ল, বিশেষত হারাধনকে। কিন্তু কেউই কিছু বলতে পারলে না। কোন খবরই মিলল না। ভয় দেখানো হ'ল সবাইকে নানা রকমে—তবুও না।

এর পাঁচ ছ দিন পরে নরেনের জ্বর হ'ল। সামান্য ঘুষঘুষে জ্বর। ইনফ্লুয়েঞ্জা নিশ্চয়ই—নতুন হিমের সময়, সকলকারই এমনি হচ্ছে।

তিন দিন ডাক্তার ডাকা হ'ল না। তারপর পাড়ার কৈলাসবাবু এলেন। কত দিন পরে বড় ডাক্তার আনা হ'ল একজনকে।

টাইফয়েড ? না।

ম্যালেরিয়া ? না।

কালাজ্বর ? না।

কী তবে ? ডাক্তার ধরতে পারেন না। পনেরো কুড়ি দিন হয়ে যায়...কোন মীমাংসাই হয় না। আরও বড় ডাক্তার এলেন। নরেনের বাবা প্রাণপণে চেপে-রাখা সংশয়টাও প্রকাশ করে ফেললেন, 'তবে কি আপনারা টি. বি. সন্দেহ করছেন ?'

তাও ত নয়। যত রকম পরীক্ষা আছে ডাক্তারী শাস্ত্রে একে একে সব শেষ হ'ল। এক্স্-রে...থুথু, রক্ত, প্রস্রাব... কিছুই দেখতে বাকী রইল না। কোন কিছুই পাওয়া যায় না, অথচ জ্বর সেই একশ' পর্য্যন্ত রোজই ওঠে।

কেউ বললে, লিভারের জ্বর। কেউ বললে, বয়সের গরম... ওটা আসলে জ্বর নয়। ডাক্তার বললে...ভাত দাও। কাকা

বললেন, 'হোমিওপ্যাথ ডাকো দাদা ভালো চাও ত। আমি কবে থেকে বলছি। এরা রোগ নির্ণয় না করতে পারলে ত আর চিকিৎসা করতে পারবে না। হোমিওপ্যাথদের সিম্‌টম্‌ দেখে চিকিৎসা...'

নরেন ক্ষীণ হেসে মাকে একদিন বললে, 'মিথ্যে ব্যস্ত হচ্ছ মা—এ আমার সারবার অসুখ নয়।'

মা প্রায় আর্ত্তনাদ করে উঠলেন, 'কী বলছিস্‌ রে যা-তা! ছি ছি, অমন অলক্ষুণে কথা বলতে নেই—'

'ঠিকই বলছি মা। তোমরা ভয় পাবে বলে বলিনি। সেই কালো মেয়েটা রোজ আসে আমার কাছে। তোমরা কেউ না থাকলেই পায়ের কাছে এসে দাঁড়ায়, মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসে। কত বকেছি, কত ভয় দেখিয়েছি শোনে না। তোমরা এলেই বা জেগে উঠলেই যেন বাতাসে মিলিয়ে যায়--। আবার পরশু স্বপ্নে দেখলুম মেয়েটা বলছে, তুমি আমাকে ফেলে এসে ঐ বিজয়াকে নিয়ে সুখে থাকবে ভেবেছ—না ? তা আমি হতে দেব না কিছুতেই। তোমাকে আমি ওর হাত থেকে কেড়ে নিয়ে যাবোই—।'

আরও একটু হাসল নরেন। আরও ক্লান্ত, আরও ক্ষীণ সে হাসি।

হেমলতা চীৎকার করে কেঁদে উঠলেন। বাড়ীসুদ্ধ সবাই ছুটে এল। বাবা কাকা সকলে তিরস্কার করতে লাগলেন, 'এতদিন বলিসনি কেন খোকা—কী সর্ব্বনাশ করেছিস্‌ বল ত।'

'তোমরা ভুলে যাচ্ছ কেন যে আমি বিজ্ঞানের ছাত্র, এসব আমাকে বিশ্বাস করতে নেই। অনেক দিন ধরে নিজের সঙ্গেই যুদ্ধ করেছি—এসব মিথ্যা, রুগ্ন মস্তিষ্কের কল্পনা বলে

বোঝাবার চেষ্টা করেছি নিজেকে। কিন্তু আর পারলুম না।’

সেই দিনই একজন ছুটলেন হাওড়া জেলার এক গ্রাম থেকে রোজা আনতে। পুরুত ঠাকুরকে ডাকা হ’ল—পরশু দিন ভাল তিথি ক্ষণ আছে, সেদিন তিনি শান্তি স্বস্ত্যয়ন করবেন। এক হাজার আট তুলসী দেবেন নারায়ণকে, আরও কত কি।

হেমলতা সন্ধ্যাবেলা একা ছাদে গিয়ে হাত জোড় করে বললেন, ‘কে এসেছ মা, দয়া করে আমার ছেলেকে ছেড়ে দাও, আমি নিজে গিয়ে গয়ায় পিণ্ডি দিয়ে আসব। নয়ত আমাদের কাউকে নিয়ে ওকে অব্যাহতি দাও।’

ওঝা ডাকতে যে গিয়েছিল সে শেষ-রাত্রে ফিরে এসে বললে, ‘আজই সন্ধ্যাবেলা সে এসে পেঁছবে। একটা জরুরী ডাক আছে ভাই, নইলে সঙ্গেই আসত। যাক তাকে টাকা আর ঠিকানা দিয়ে এসেছি, মোটা বখশীষের লোভ দেখিয়েছি। কোন ভয় নেই।’

কিন্তু বেলা দশটা থেকে অকস্মাৎ জ্বর বিষম বেড়ে উঠল। ভুল-বকা শুরু হ’ল। কেবলই যেন কাকে বলছে, ‘কেন এমন করে সঙ্গে সঙ্গে আছ, আমার ভয় করে যে। তোমাকে আমার একটুও ভাল লাগে না, একটুও না। আমাকে নিয়ে গেলেও তোমার কোন লাভ হবে না। আচ্ছা, দেখো মিছিমিছি এত কাণ্ড করছ। তোমাকে আমি কিছুতেই ভালবাসতে পারব না।’

ডাক্তার এলেন তিন চার জন। মাথায় বরফ চাপানো হ’ল। মা ঘর-বার করতে লাগলেন ওঝার জন্য। পুরুতকে ডেকে পাঠানো হল, আজই কিছু করা যায় না ?

তিনি বললেন, 'মা, আজকের দিন ভাল না। হিতে বিপরীত হ'তে পারে।'

বিকেলের দিকে জ্বর কম্‌ল কিন্তু ডাক্তারের মুখ হয়ে উঠল আরও গম্ভীর। স্পষ্ট শ্বাস লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, নাড়ীও পাচ্ছেন না তাঁরা। ইন্‌জেকশ্যন্‌ অক্সিজেন, চেষ্টার কোন ত্রুটিই হল না। সন্ধ্যার সময় একবার চোখ খুলে শুধু বললে, 'মা, ভেবোনা তুমি আমি আবার পালিয়ে আসব— এবার হয়ত কাকীমার কোলে জন্মাবো। কিন্তু যেমন ও জোর করে নিয়ে যাচ্ছে, ওর কাছে কিছুতে থাকব না। ওকে জব্দ করবই—দেখে নিও—'

কথা কটা বলেই আবার ক্লান্তভাবে চোখ বুজল। মা কাকীমার কান্নাও বোধ হয় ওর কানে গেল না।

ওধারে নিচে ততক্ষণে হাওড়ার সেই সুদূর গ্রাম থেকে রোজা এসে পেঁচেছে।

এই কথাটাই চেপে ছিলেন ওঁরা প্রাণপণে। বোধ হয় ভুলেও আসছিলেন। অন্তত নিশ্চিন্ত যে হয়েছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। নরেনের সঙ্গেই ত শেষ হয়ে গেছে— কনকের ওপরে আর তার বিদ্বেষ কেন থাকবে? বিজয়ারও বিয়ে হয়ে গেছে কবে।

কনকের কানের পিছনে একটি ছোট্ট তিল আছে যেমন নরেনের ছিল। কিন্তু তা থাক। কনকই যে নরেন একথা বিংশ শতাব্দীতে কেউ বিশ্বাস করবে না। আর করলেই বা কি? ঈর্ষা বিদ্বেষ কি জন্মান্তরেও চলে?

তবু কনকের মা কাঁদতে কাঁদতে ছুটে এলেন বিজয়ার

কাছে, 'ওরে সর্ব্বনাশী তুই যা, তুই চলে যা। আর কত সর্ব্বনাশ করবি আমার বংশের ?'

তারপর একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে ওর হাত দুটো ধরে বললেন, 'ভাই, মাথার আমার ঠিক নেই। কি বলতে কি বলেছি—কিন্তু জানিস ত সবই, আমার মনের অবস্থাও ত বুঝছিস ? কিসে কি হয় তা কে জানে, ঘরপোড়া গরুর মত ভয় আমাদের, তুই যা ভাই।'

অপমানে চোখ মুখ রাঙা হয়ে উঠল বিজয়ার। কিন্তু সে চলেই গেল শেষ পর্য্যন্ত। কনকের কথা শুনে সে আগেই কেমন উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে উঠেছিল। হয়ত ভয় পেয়েছিল সে-ও।

অতীতের তীর থেকে কোন স্মৃতির বাতাসও কি দোলা দিয়েছিল তার মনে ? দেওয়াই ত স্বাভাবিক। সুন্দর সুপুরুষ মিষ্টভাষী নরেন তার প্রথম কৈশোরের তরুণ দেবতা। সে কি সত্যিই তাহলে ফিরে এসেছে কনকের মধ্যে ?

বিজয়ার চলে যাওয়াটাই একমাত্র বিষাদের পর্ব্ব এই বিবাহানুষ্ঠানে। যাই হোক—সন্ধ্যার দিকে সবাই একরকম ভুলে গেল সে কথা। নিরাপদে ও নির্ব্বিঘ্নে বিয়েটা চুকে গেল। নাচে গানে আমোদ আহ্লাদে বাসর-ঘরে মেতে উঠল সকলেই।

শেষ রাত্রে দেখা গেল বারান্দার এক কোণে কনক শুয়ে ঘুমোচ্ছে মেঝেতেই। ওর মা তাড়াতাড়ি ঠেলে তুলে দিতে গিয়ে দেখলেন গা গরম।

আশঙ্কায় প্রায় সবাইকারই মুখ শুকিয়ে উঠল, যদিও মুখে কেউ কিছু বললে না। অবশ্য যার জ্বর সে অত গ্রাহ্য করেনি। হেসে খেলে বেড়ালো সারা সকালটা। এমন কি

বর-কনে বেলা এগারোটা নাগাদ যখন বিদায় হ'ল তখনও সে এসে তাদের গাড়ীতে তুলে দিয়ে গেল। কিন্তু বিকেলে শুয়ে পড়তে বাধ্য হল বেচারী। জ্বর তখন একশ' দুই।

ডাক্তার এল তখনই। এবার আর ভুল হয়নি। সেই-দিনই রোজা ডাকতে পাঠানো হল। তুলসী দেওয়ারও ব্যবস্থা হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

রোজা এসে তার যা কৃত্য করাল। অবশ্য সবটাই কনকের কাছে গোপন রাখা হয়েছিল। পুরুত ঠাকুরের পরের দিনকার স্বস্ত্যয়নটার কথাও সে জানে না।

কিন্তু সব চুকে যাবার পরও সন্ধ্যাবেলা হঠাৎ একটু তন্দ্রা থেকে জেগে উঠে কনক বললে, 'মা, অদ্ভুত একটা স্বপ্ন দেখলুম জানো ?...মনে হ'ল কে একটা কালো-মত মেয়ে—সেই যেমন সেদিন দেখেছিলুম—এসে ঐ পায়ের কাছটায় দাঁড়িয়ে বলছে, 'আমি চললুম কিন্তু তোমাকেও রেখে যাবো না। তুমিও আসবে শিগ্‌গিরই।...কী বিশ্রী স্বপ্ন—না মা ?'

জ্যাঠাইমা ঠাকুরঘরে পড়ে রইলেন দিন রাত। বাড়ীসুদ্ধ সকলকারই মানসিকের পর মানসিক জমতে লাগল মনে মনে। জ্বর কিন্তু কমল না। আবারও সেই রক্ত, থুথু, প্রস্রাব পরীক্ষা হ'ল। এক্‌স্‌রে হয়ে গেল। শেষে হোমিওপ্যাথও ডাকা হ'ল। তবু জ্বর সেই এক ভাবেই রয়ে গেছে।

আজও তা ছাড়েনি। কোন দিন ছাড়বে কিনা কে জানে। অনেকে বলছে হাওয়া বদল করতে, কিন্তু ডাক্তারদের তা মত না। অত দুর্ব্বল, নাড়াচাড়া করা ঠিক নয়।

উপস্থিতি

বিকাশের আর্থিক অবস্থা খুব সচ্ছল না হলেও তার প্রথম ছেলের অন্নপ্রাশনে বোন চারটিকে বাদ দিতে পারলে না। অনেকগুলি বোনের এক মাত্র ভাই হিসাবে বাল্যে ও কৈশোরে তাদের ওপর যথেষ্ট অত্যাচার করেছে—ওর বাবা-মা প্রকাশ্যেই মেয়েদের বঞ্চিত করে সব চেয়ে ভাল জিনিসগুলি ওকে দিয়েছেন, সমস্ত কিছু স্বাচ্ছন্দ্য এবং আরামে তারই অধিকার এটা ক্রমশঃ তারও বিশ্বাস হয়ে গিয়েছিল—তবু সেই সব অতীত দিনগুলির বিস্মৃত ইতিহাস বোনেদের প্রতি প্রীতি ভালোবাসাও কোন্ অলক্ষ্যে জমিয়ে রেখে গেছে ওর মনের গহন গহ্বরে। বিকাশ তাই বোনদের বাদ দিয়ে কোন উৎসব আনন্দের কথা আজও ভাবতে পারে না।

স্ত্রী নির্মলা আপত্তি তুলেছিল বৈকি !

'এই বাজার ! ঠাকুরঝিরা ত একা আসবেন না—রোজ দুধই লাগবে চারসের করে। চাল ত ব্ল্যাকে পাঁচসিকে করে সের হয়ে গেছে—কত খরচ করবে তুমি ? তাছাড়া এই ত মোট চারখানি ঘর, ছেলেমেয়ে, চ্যাঁ ভ্যাঁ—পারবে সইতে ?'

'তা আর কি করা যাবে বলো ? এই ত প্রথম কাজ আমাদের। তাদেরও আমি একটি মাত্র ভাই, কী মনে করবে বলো ? তাহলে এ আয়োজনই বন্ধ করতে হয়।'

নির্মলা বেশি জোর দিতে পারেনি, কারণ তার নিজের দুটি বোনকে ইতিমধ্যেই টাকা পাঠিয়ে দেওয়া হয়ে গেছে এখানে আসার জন্য। তবু ত বিকাশের বোনদের কাউকেই রাহা খরচা দিতে হবে না।

বিকাশের দিদি থাকেন এলাহাবাদে, মেজ-বোন অলকা নাগপুরে, সেজ-বোন জ্যোতি পূর্ণিয়ায় এবং ছোট-বোন মায়া খড়গপুরে। অর্থাৎ চারজন চারদিকে। কিন্তু বিচিত্র কারণে ওরা চারজনে একই দিনে এবং দুটি বোন অলকা ও মায়া একই ট্রেনে এসে পেঁছিল। তার ফলে উল্লাসের যে হুল্লোড় উঠল সেদিন তা অবর্ণনীয়। তবু রক্ষা ওরা সব ছেলেমেয়ে নিয়ে আসেনি প্রত্যেকেই দু-একটি করে বাড়ীতে রেখে এসেছে। মায়ার একটি মাত্র মেয়ে, সেটিকেও সে নিয়ে আসেনি, শাশুড়ীর হেফাজতেই আছে।

তা হোক্ আনন্দের রেশটা দুপুর থেকে শুরু করে প্রায় সারাদিনই চলল। এমন কি নির্মলাও সে আনন্দে যোগ না দিয়ে পারেনি। এ ক'দিনের জন্য একটি ঠাকুর রাখা হয়েছিল, তাকে সব বুঝিয়ে দিয়ে সে সন্ধ্যার পর অতিরিক্ত এক কেত্‌লি চা নিয়ে এসে বসেছিল এদের সঙ্গেই ভেতরের চওড়া বারান্দায়।

পুনর্মিলনের প্রাথমিক উচ্ছ্বাসটা কমে গেছে তখন, তখন শুধু চলেছে দু-একটা খুচরো আলাপের ফাঁকে ফাঁকে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে ভগ্নীপতিদের আর্থিক অবস্থার একটা আভাস পাবার চেষ্টা। সতীর নূতন জড়োয়া দুল আর মুক্তার কণ্ঠী হয়েছে। তা অবশ্য হতে পারে— স্বাধীনতা পাবার পর ওঁর স্বামী একটা খুবই বড় গোছের কি চাকরি পেয়েছেন। অলকার স্বামী কি সব যেন ব্যবসা করে, তার অবস্থার হদিশ পাওয়া শক্ত। অলকার গায়ে মূল্যবান গহনা এবং বাক্সে সিল্কের শাড়ির অভাব নেই কিন্তু তার কোনটাই খুব আধুনিক নয়। জ্যোতির বর প্রফেসর,

আর্থিক অবস্থা খুব ভালো নয়, তবু তার স্বামী যে বিদ্বান—আর সে-হিসেবে এদের সকলের চেয়েই বড় এ-কথাটা আকারে-ইঙ্গিতে সর্বদাই প্রকাশ করতে চায় সে। মায়ার স্বামী রেলের কারখানার ফোরম্যান; সে এরই মধ্যে বার-চারেক বলেছে, 'যতই বলো আজকাল মেকানিক্যাল লাইনেই পয়সা, এটা হল গে যন্ত্রের যুগ !'

চায়ের কেত্‌লি শেষ হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। নানা প্রসঙ্গ ছুঁতে ছুঁতে আর্থিক সঙ্গতির কথাও উঠে পড়ে। সতী কি একটা বড় মানুষী দেখাতে গিয়ে জ্যোতির কাছে ঠোক্কর খান। জ্যোতি বলে, 'দিদি, বড় জামাইবাবু যতই মাইনে পান আজ-কালকার দিনে সংসার খরচাও ত কম নয়।...চুরির পয়সা বা ঘুষের পয়সা না হলে জড়োয়া গয়না গায়ে দেওয়া যায় না—এটা তোমাকেও মানতে হবে !'

ব্যাপারটা দারুণ অপ্রীতিকর হয়ে উঠত যদি না এরই ভেতর বিকাশ নীচে থেকে উঠে আসত। বিকাশ এসে বড় মিট্‌সেফ্‌টায় ঠেস্‌ দিয়ে দাঁড়িয়ে সস্মিত মুখে বোনদের লক্ষ্য করে। বোধ করি এদের মুখের চেহারায় মানসিক দুর্যোগের আভাস পেয়েই অন্য প্রসঙ্গ পাড়ে, 'আজ অনেক দিন পরে যেন আমরা সেই ছেলেবেলায় ফিরে গেছি, না ? সব্‌বাই একসঙ্গে—কতকাল পরে !'

'সব্বাই' শব্দটায় একটু বেশি জোর দেয় কি বিকাশ ?

হয়ত দেয়। উপস্থিত সকলকার চোখেই যেন বেদনার ছায়া ঘনিয়ে আসে।

সতী দীর্ঘশ্বাস ফেলে একটা, 'সব্বাই আর কৈ বল—! মণি যে এমন করে—'

মণি !

মণিই নেই। মায়ার ঠিক ওপরের বোন মণি। বিয়ের সব ঠিকঠাক, আগের দিনে রাত্রে ষ্টোভ ধরাচ্ছিল সতীর খোকার দুধ গরম করবে বলে। পাশে ছিল স্পিরিটের বোতল, কখন খোকা হামাগুড়ি দিয়ে গিয়ে বোতল ফেলে দিয়েছে তা কেউই লক্ষ্য করেনি। চোখের নিমেষে খোকাকে তুলে ধরেছে মণি কিন্তু নিজেকে বাঁচাতে পারেনি। রেশমের শাড়ি জ্বলে উঠেছে মুহূর্তের মধ্যে ! ...দিশাহারা সতী এক বালতি ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিয়েছিল। তার ফল যা হবার তাই হল—হাসপাতালে গিয়ে মোটে এক ঘণ্টা বেঁচে ছিল বেচারী।

কিন্তু...

অকস্মাৎ সবাই চমকে ওঠে।

একি ? সতী আর নির্মলার মধ্যে এই ফাঁকটা এতক্ষণ ছিল কি ? এরা সবাই কাছাকাছি ঘেঁষাঘেঁষি করে, চায়ের কেৎলি আর কাপগুলোকে কেন্দ্র করে গোল হয়ে বসেছিল। তার মধ্যে কোন ফাঁক ত ছিল না। রাখা সম্ভবও নয়—বালিগঞ্জের বাড়ি, ওপরের দালানে এত স্থান নেই যে ছড়িয়ে বসবে। এতদিন পরে সকলে মিলেছে, দূরে দূরে বসবার ইচ্ছাও ছিল না কারুর। এতবড় একটা ফাঁক ত তার মধ্যে ছিল না। ঠিক পুরো একটি মানুষের বসবার মত ফাঁক।

কেউই মনের কথা কাউকে জানায় না, কিন্তু ঐ এক প্রশ্নই জাগে সকলের মনে। কে বসেছিল এখানে ? কোথায় গেল? কখন গেল ?

তাছাড়া, তাছাড়া কেমন যেন ওদের মনে হচ্ছিল যে সব্বাই, সব্বাই ওরা মিলেছে এখানে, অনেক দিন পরে। মণি

যে ওদের মধ্যে নেই, কৈ সে কথা ত এতক্ষণ কারুর মনে পড়েনি।

অথচ মণি যে ছিলনা, এটাওত ঠিক। কোথা থেকে আসবে সে। বেচারী মণি, সে-ই সব চেয়ে সুন্দর ছিল ওদের মধ্যে। আর সেই শুভ্র সুন্দর তনুদেহ কবেই ছাই হয়ে গেছে লেলিহান চিতাবহ্নিতে।

তবে কেন ওদের এমন মনে হল ? এই পরিপূর্ণতা বোধ কোথা থেকে এল ওদের মনে ?

ক্রমশ বিকাশের মাথাতেও চিন্তাটা জাগে। ও যখন এল, প্রথম এসে এখানে দাঁড়াল, তখন এই শূন্যতাটা ছিল কি বৈঠকের মধ্যে ? মনে ত হয়না।

আর কে ছিল ? কেউইত এদিকে নেই। নির্মলার ভাই-বোনরা এখনও এসে পৌঁছয়নি। তারা কাল আসবে। পিসিমা নিচে আছেন, তিনি নিচেই থাকেন, এতখানি সিঁড়ি ভাঙা তাঁর পক্ষে সম্ভবও নয়, তাঁর বিষম হার্টের অসুখ।

তবে ?

আর গেলই বা কোথা দিয়ে। কাউকে যেতেও ত দেখা যায়নি।

অস্বস্তিকর নীরবতা ভাঙে বিকাশ প্রচন্ড একটা হাই তুলে।

'দিদি ফর্দ-টর্দগুলো দেখলে হোত না ? বাজার কি এল না এল—'

জ্যোতি একেবারে উঠে দাঁড়ায়, 'তাই চলো দিদি—। সত্যি সব দেখা উচিত ছিল এতক্ষণ—'

সবাই নেমে আসে নিচে। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের ফর্দ নিয়ে বসে সবাই! কাকে কাকে বাদ দেওয়া সম্ভব, কাকে কিছুতেই বাদ দেওয়া চলবে না—এই নিয়ে আবার তর্ক বেধে ওঠে। বোনের দল নিজের নিজের শ্বশুরবাড়ির সম্ভ্রম রক্ষার জন্য সজাগ হয়। শুধু মায়া উঠে যায় ওপরের ছাদে, মণির কথা মনে পড়ে যেন কান্না পায় ওর।

রাত্রে আবার খেতে বসে সকলে একসঙ্গে। বিকাশের খাওয়া হয়ে গিয়েছিল ছেলেপুলেদের সঙ্গেই। ছেলেদের ঘুম পাড়িয়ে রেখে এসে গভীর রাত্রিতে এরা পাঁচজন খেতে বসল। নির্মলা আর চার বোন। আহারের চেয়ে গল্প-গুজবেই যেন বেশি ঝোঁক—সুতরাং সত্যিসত্যিই যখন খাওয়া শেষ করে এরা উঠে দাঁড়াল তখন রাত বারোটা বেজে গেছে, থম্ থম্ করছে রাত।

ঝি বসে বসে ঢুলছিল, এরা আঁচাতে উঠে তাকে ডেকে দিলে, সে এঁটো বাসন ঘরে তুলে রেখে দালান ধুয়ে শুতে যাবে। ওর আর ঠাকুরের খাওয়া ইতিমধ্যেই শেষ হয়ে গিয়েছিল।

হঠাৎ ঝি চেঁচিয়ে উঠল, 'বৌদি!' কতকটা যেন আর্তনাদের মত ওর আহ্বান।

'কী রে হরির মা?' নির্মলা ব্যস্ত হয়ে এগিয়ে আসে।

'তোমরা কজন খেলে বলোত বাপু?'

'তোর কি ঘুমের ঘোরে সব গুলিয়ে গেল নাকি? আমরা পাঁচজনই ত বাকী ছিলুম, আর কজন খাবে?'

ততক্ষণে আরও দু জন এসে গেছে। হরির মা নিঃশব্দে আঙুল দিয়ে এঁটো থালাগুলোর দিকে দেখিয়ে দিলে, ছখানা

থালা, ছজনের খাওয়ার চিহ্ন স্পষ্ট।

বহুক্ষণ কারুর মুখ দিয়ে কথা বেরোল না। অনেকক্ষণ পরে নির্মলা শুধু বলে উঠল, 'সে কি!' তারপর কতকটা যন্ত্রচালিতের মতই সে আঙুল দিয়ে নিজেদের একবার গুণে নিলে! যেন ভুল হওয়াও সম্ভব।

ছটা থালা, বারোটা বাটি। সব থালাতেই আহারের চিহ্ন স্পষ্ট। মাছের কাঁটা, ডালের বাটিতে অবশিষ্ট ডাল, রুটির টুকরো—ভুল হবার কোন কারণই নেই।

ততক্ষণে নতুন ঠাকুরও এসে দাঁড়িয়েছে।

'ঠাকুর, তুমি ক-থালা খাবার দিয়েছ?' নির্মলা প্রশ্ন করে।

'কেন বৌদি, পাঁচ থালা।'

বলতে বলতেই তারও নজর পড়ল।

'সে কি!'...আপনারা ত পাঁচ জনই। পাঁচ থালাই ত বেড়েছি মনে হচ্ছে।'

হরির মা বলে, 'তা ছাড়া ও নতুন মানুষ, যদি ভুল করে দিয়েই থাকে, খেয়ে গেল কে?...বাইরের লোক, চোর টোর কেউ আসেনি ত?'

'দূর পাগল! আমরা এতগুলো লোক বসে খেলুম, অন্য কেউ এলে টের পেতুম না?'

সতী বলে ওঠে, 'আগের এঁটো বাসন ছিল না?'

'না ত। আমি সব পেড়ে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে দিয়েছিলুম।'

নির্মলা হেঁট হয়ে দেখে বলে, 'বাসন ত আমাদেরই—'

নিচে একটা গন্ডগোলের আভাস পেয়ে বিকাশ নেমে এল।

'কী হয়েছে, ব্যাপার কি ?'

সব শুনে প্রথম তারই মুখ শুকিয়ে উঠল। আশ্চর্য এই যে, সন্ধ্যার ঘটনাটা তারই আগে মনে হল। এরা এত বিস্মিত হয়েছিল যে ভাববার কোন কারণ আছে তা কারুরই মাথায় যায় নি।

'যাকগে, এখন এই এত রাত্তিরে আর অত গবেষণায় কাজ নেই। চলো সব শুয়ে পড়বে।...রাত প্রায় একটা বাজে। বাসন ত আর চুরি যায়নি—নিশ্চয় কোথাও কোন ভুল হয়েছে—'

বিকাশ এক রকম জোর করেই ওদের ঠেলে ওপরে নিয়ে গেল।

দোতলার বড় ঘরটাতে বিকাশ শোয়, সে ইচ্ছা করেই বোনদের সে-ঘর ছেড়ে দিয়ে পাশের ছোট ঘরে গেছে। এ ঘরে খাটের ওপর শুয়েছে জ্যোতি, ওর কোলের মেয়ে আর মায়া। নিচে যে বড় বিছানাটা পড়েছে তাতে পাশাপাশি বহু বালিশই পড়েছে—নির্মলা, অলকা, সতী আর বাকী সব ছেলেমেয়ে।

রাত্রে শুয়েও কিছুক্ষণ ভোজনপর্বের ধাঁধাঁ নিয়ে আলোচনা চলেছিল বৈ কি ! সুতরাং ভোরে ওঠবার ইচ্ছা থাকলেও সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে একটু বেশি। ছটা নাগাদ জ্যোতির মেয়ে একটা বড় গোছের অপকর্ম করে ফেলায় ওরই ঘুম ভেঙে গেল সকলের আগে। সে মেয়ের কাঁথা প্রভৃতি সামলে তাকে কোলে তুলে নিয়ে একটা হাই তুলে নিদ্রাতুর দৃষ্টিতে নিচের দিকে তাকালে। তখনও ঘুমে তার চোখ যেন জুড়ে আসছে ! আর একটু ঘুমোতে পারলে বাঁচে সে। এই ত

এত ছেলেমেয়ে এখনও ঘুমোচ্ছে, তার মেয়েরই যত রাজ্যের বদভ্যাস !...কিন্তু—

ও কি !

হঠাৎ যেন একটা প্রচন্ড ধাক্কা খেয়ে জ্যোতির ঘুম ছুটে গেল। সমস্ত জড়তা চোখের নিমেষে কেটে গিয়ে সোজা হয়ে বসে নিচের বিছানাটার দিকে ভাল করে চেয়ে দেখলে।

সার সার পাশাপাশি বালিশ, সব বালিশেই মাথা আছে কেবল নির্মলা আর সতীর মধ্যে একটা বালিশ খালি। সেখানে একজন লোকের শোবার মত স্থানও শূন্য। যেন এই মাত্র কে উঠে গেছে।

কিন্তু কে গেল ?

ঐ ত দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। ছেলেমেয়েদের দিকে তাকিয়ে ভাল করে গুনলে জ্যোতি, মিলিয়ে নিলে সাবধানে। সবাইত আছে। নির্মলার এপাশে তার খোকাও ঘুমোচ্ছে। তবে, তবে—?

জ্যোতি অধ্যাপকের স্ত্রী। সে মনোভাব দমন করবার কিছু শিক্ষা এতদিনে পেয়েছে। মেয়েকে কোলে করেই যতটা সম্ভব নিঃশব্দে দোর খুলে বেরিয়ে এল। বিকাশ তখন সবে উঠে দাঁত মাজছে। ওকে দেখেই হাসি হাসি মুখে কি একটা বলতে যাচ্ছিল কিন্তু জ্যোতির মুখের চেহারাটা দেখে সে হাসি মিলিয়ে গেল।

'দাদা শোন !'

'কী রে ?'

নিজের ঠোঁটের ওপর আঙুল চেপে ধরে ওকে চুপ করতে ইঙ্গিত করে জ্যোতি। তারপর তেমনি ইসারা করেই দেখায়

ঘরের দিকটা। ওর সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢুকেই বিকাশ বুঝতে পারে ব্যাপারটা। বিবর্ণ, পান্ডুর হয়ে ওঠে তার মুখ।

মিনিট পাঁচেক সময় লাগল নিজেকে সামলে নিতে। তারপর বিকাশ হৈ-চৈ চেঁচামেচি করে সকলকে তুলে দিলে। সে চেঁচামেচি ও হাসাহাসিতে আর কারুর শয্যার সেই শূন্য স্থান চোখেই পড়ল না।

তবু কথাটা চাপা রইল না এটাও ঠিক।

বিকাশ বললে চুপি চুপি নির্মলাকে। জ্যোতি বললে তার দিদিকে। দুপুরের আগে বড়রা সবাই জানতে পারলে কথাটা।

নির্মলা শুষ্ক মুখে বললে, 'আজ বাদে কাল শুভ কাজ—একি অলক্ষণ বলোত! তুমি বাপু আজই ভটচায্যিকে ডেকে একটা কিছু তুলসী-টুলসী দেওয়াও। আর ত মোটে একটা দিন বাকি—'

বিকাশ উড়িয়ে দেয় কথাটা, 'হ্যাঁ—তুমিও যেমন! কোথায় না কি, আমি অমনি ভট্চায্‌কে ধরে তুলসী দেওয়াই। এই বাজারে নাহোক, দশ পনেরো টাকা খরচা!'

'কিন্তু একি ব্যাপার তা দ্যাখো!'

'ব্যাপার ছাই! হয়ত কারুর দুষ্টুমি কি আর কিছু—'

উড়িয়েই দেয় কথাটা বিকাশ, যদিও মনের মধ্যে জোর পায় না। কখন চুপি চুপি বাইরে গিয়ে একটা ছোট লোহা এনে পরিয়ে দেয় জ্যোতির ছোট মেয়েটার হাতে। আর সকলকারই ছোট ছেলেমেয়ের হাতে ওটা ছিল, শুধু অধ্যাপকের স্ত্রী বলে জ্যোতিই ওসব কুসংস্কারকে প্রশ্রয় দেয়নি। আজ কিন্তু দাদার

ব্যাপারটা দেখেও দেখল না সে।

বিকেলের দিকে নির্মলার দুই বোন এবং ছোট ভাই এসে পড়াতে আরও একচোট হৈ হৈ হল। সে হাসি-হুল্লোড় এবং চেঁচামেচির মধ্যে সকালের আতঙ্ক কোথায় মিলিয়ে গেল।

কেবল সতী নিশ্চিন্ত হতে পারেনি। দুপুরে সকলে ঘুমোলে ওর মনে হল যে আরও দুটো পান সংগ্রহ করে আনা দরকার। তখন আর কাউকে ডাকাডাকি না করে নিজেই নেমে গেল নিচে, ভাঁড়ার ঘর থেকে আর দুখিলি পান আনবে বলে। নামবার মুখে সিঁড়ির বাঁকে বড় ধাপটাতে পা দিতেই ওর মনে হল ঠিক পিছন দিক থেকে কে যেন চুপি চুপি বলে উঠল, 'খোকাটাকে নিয়ে এলিনে কেন দিদু, কতদিন দেখিনি!'

ভয়ে পাথর হয়ে গিয়েছিল হাত-পা। শুধু শক্তি ছিল না বলেই চেঁচিয়ে উঠতে পারেনি।

পরিষ্কার মণির গলা। এ আওয়াজ সতীর ভুল হবে না।

পা-পা করে আবার উঠে এসে প্রায় অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল সে। তারপরই এরা এসে পড়ায় আর কাউকে বলা হয়নি।

এরই মধ্যে ঠিক সন্ধ্যার আগে আর একটি ঘটনা ঘটল।

নির্মলা খোকাকে দুধ খাওয়াবে বলে দুধের বাটি ঘরের মেঝেতে নামিয়ে রেখে বাইরে গিয়েছিল ঝিনুক আনতে। খোকা তখন ছোট ঘরের মেঝেতে শুয়ে খেলা করছে। তখনই অবশ্য ফিরে যাওয়া হয়নি, সতীর ছোট ছেলেটা অলকার ছেলের চুলের মুঠি চেপে ধরে হাতে কামড় দেওয়ায় একটা কুরুক্ষেত্রের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল বলে মিনিট তিনচার দেরি হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কোনমতে ওদের ছাড়িয়ে দিয়ে ভেতরে এসে দেখলে দুধের বাটি খালি !

তবে কি বেড়ালে খেয়ে গেল ? না কি আর কেউ ? কৈ, কেউ ত আসেনি এদিকে। বেড়ালও নেই কোথাও।

তবে ?

ছেলের দিকে চাইতেই নির্মলার নজর পড়ল পেটটাও বেশ উঁচু উঁচু। তাড়াতাড়ি হেঁট হয়ে মুখ শুঁকে দেখলে—দুধেরই গন্ধ। শুধু তাই নয়, কোলে তুলে নিয়ে ছুটে বেরিয়ে আসতে আসতে এক ঝলক দুধ তুলেও দিল সে।

এবার আর সঙ্কোচ বা লজ্জার কারণ রইল না। মেয়ে-মজলিশ বসে গেল। সতীর কথাও শোনা গেল ! পিসিমা এতক্ষণ পর্যন্ত কিছুই শোনেননি, তিনি সব শুনে বললেন, 'কি সর্ব্বনাশ ! তোরা এখনও চুপ করে করে আছিস ? কি রে তোরা। সাহস বলিহারি যাই তোদের ! আমি তখনই বৌকে বলেছিলুম যে মেয়েটা অপঘাতে ম'ল একটা গয়া-টয়ার ব্যবস্থা কর্—সে শুনলে না, খোকা ত শুনবেই না, ওরা হল সায়েব মানুষ। এখন হল ত !'

সর্বসম্মতিক্রমে স্থির হল যে কাল নান্দীমুখে বসবার আগেই অন্তত নারায়ণকে একশ আটটি তুলসী দেওয়াতে হবে ভট্চাযকে দিয়ে। বিকাশও আর আপত্তি করতে সাহস করলে না।

সকলেরই গা ছম্ছম্ করছে কিন্তু কে জানে কেন মায়ার ভয়ের চেয়ে দুঃখই বেশি হচ্ছে। বেচারী মণি। কত সাধ-আহ্লাদ কামনা অসম্পূর্ণ রেখে যে সে বিয়ের আগের দিন চলে গেল ! সে বেঁচে থাকলে আজকের দিনে কত আনন্দই করত। তারও ত সাধ যায়, ওদের সঙ্গে বসে হুল্লোড় করতে, সবাই

মিলে বসে চা খেতে, শুতে, গল্প করতে। নির্মলার ছেলেত তারও ভাইপো, প্রথম ভাইপো। তাকে যদি দুধ খাওয়াবার সখ হয়েই থাকে ত দোষ দেওয়া যায় না মণিকে। আর সতীর খোকা—তার জন্যই প্রাণটা গেল বেচারীর, তার ওপর টানও স্বাভাবিক। এরা যে কেন এত ভয় পাচ্ছে মায়া তা বোঝে না।

কান্না পাচ্ছিল মায়ার—মণির কথা মনে করে। সে এক সময় এদের মজলিশ থেকে উঠে নিঃশব্দে ছাদে চলে যায়। পরিশ্রম নেই কিন্তু ক্লান্তিতে পা অবসন্ন। কোনমতে দেহটাকে টেনে টেনে নিয়ে যায়।

অন্ধকার ছাদ। তবু ভয়ের কোন কারণ নেই, আসে-পাশে বহু বাড়ির ছাদেই মানুষ আছে। আলো জ্বলছে সব বাড়িতে। রাস্তার আলো এসে পড়েছে ওদের চিলেকোঠার দেওয়ালে।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল মায়া একভাবে। ভাবতে লাগল মণির কথাই। দু-বোন ওরা পিঠোপিঠি। খুব ভাব ছিল দুজনে, একসঙ্গে খাওয়া বসা শোওয়া সব। তবু এখন যেন সতীর দিকেই টান্‌টা বেশি মণির। অদ্ভুত কারণে একটু সূক্ষ্ম অভিমান বোধও হয় মায়ার।...

পেছনে কে এসে দাঁড়িয়েছে কখন টের পায়নি মায়া। একেবারে তার উষ্ণ নিঃশ্বাস গালে লাগাতে চমকে উঠল সে। কে ?

কৈ, কেউত নেই।

কিন্তু নিঃশ্বাসটা স্পষ্ট, ভুল হবার কোন কারণ নেই।

পা দুটো যেন আরও দুর্বল বোধ হচ্ছে, ভেঙে দুম্‌ড়ে পড়তে চাইছে হাঁটু দুটো। হাতটা মুখে তুলতে গেল, পারলে

না। বড় বেশি কাঁপছে।

সহসা হু হু করে কেঁদে ফেললে মায়া, 'ছোড়দি ভাই কেন আমাদের ভয় দেখাচ্ছিস্ এমন করে ? তুই চলে যা— বড্ড ভয় করছে। তুই থাকিসনি এখানে। আমরা কি করেছি তোর ?'

এবার আর একটা নিঃশ্বাস পড়ল কোথায়। বেশ বড় গোছের দীর্ঘ নিঃশ্বাস, শব্দ করেই পড়ল। সে নিঃশ্বাসের উষ্ণ বাষ্প যেন সর্বাঙ্গে এসে লাগে মায়ার। এত গরম কেন ? মনে হচ্ছে যেন গরম বাতাসের হল্কা একটা। ওকে সে বাতাস ঢেকে আচ্ছন্ন করে দেবে নাকি ?

কী বিষ আছে এ নিঃশ্বাসে কে জানে। মায়ার যেন আর নড়বার শক্তিও থাকে না। সেই নিঃশ্বাসের শব্দ ওর শ্রুতির মধ্যে ক্রমশই যেন বাড়ে, যেন ঝাঁ-ঝাঁ করে বাজছে কি কানে। দুই চোখের পাতা বুজে আসে। দৃষ্টির সামনে হলদে বিন্দু অসংখ্য; মহাশূন্যে অসংখ্য খদ্যোতের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে চারিদিকে।

আর কোন বোধ রইল না ওর। এ নিঃশ্বাস কি সারা আকাশে ছড়িয়ে পড়ল নাকি ? শহরের শব্দ কৈ ? দিদি—

টের পাওয়া গেল অনেক খোঁজাখুঁজির পর রাত এগারোটা নাগাদ। তখনই ডাক্তার এল। আরও বড় ডাক্তার ডাকা হল পরের দিন। সন্ধ্যার দিকে হাসপাতালেও নিয়ে যাওয়া হল। কিন্তু মায়ার জ্ঞান আর ফিরে এল না।

যেদিন অন্নপ্রাশন হবার কথা ছিল তার পরের দিন সন্ধ্যার সময় মায়া অজ্ঞান অবস্থাতেই তার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলে।

অতৃপ্ত

অতিকষ্টে বাসা ঠিক হ'ল। এই বাজার...যেখানে রাশি রাশি য়্যাড্ভান্স এবং সেলামী দিয়েও লোকে বাড়ী পায় না সেখানে যে এত সহজে ঠিক হবে তা অনিলা ভাবেন নি। বিশেষতঃ মফঃস্বল থেকে চিঠি দিয়ে। তা সুরেশ খুব কাজের ছেলে এটা মানতেই হবে—ওপর নীচে সাতখানা ঘর এই বাজারে ভাড়া মোটে আশীটি টাকা। অবশ্য এত ঘরের প্রয়োজন নেই অনিলার—এত ভাড়া দেওয়াও খুব কষ্টকর কিন্তু সুরেশ তাঁকে চিঠিতেই বুঝিয়ে দিলে যে এখন বিয়ের সময় এত বড় বাড়ীই ও'দের দরকার নইলে আবার কোথায় ইস্কুলবাড়ী কোথায় কি—এই সব করতে ছুটতে হ'ত। তাও এখন গরমের ছুটির সময় নয়—দু তিন দিন ছুটি দেখে তার মধ্যে বিয়ের দিন ফেলা বিষম অসুবিধা। তার চেয়ে বিয়ে চুকে গেলে তিনি যদি নিচের তলাটা ভাড়া দিতে চান ত ভাড়াটের অভাব হবে না। চাইকি ভাড়ারও তাঁর অনেকখানি লাঘব হবে। চাই কি—তেমন তদ্বির করলে বিনা ভাড়াতেই থাকতে পারবেন তিনি !

যুক্তিটা মনে লাগল অনিলার। তাছাড়া অত বাছতে গেলে এখন তাঁর চলবে না। সামনে মেয়ের বিয়ে। পাকিস্তান থেকে এসে তিনি ভাগলপুরে ভগ্নিপতির যে বাসায় উঠেছেন তা তাঁদের পক্ষেই পর্য্যাপ্ত নয়, অনিলা ও তাঁর তিন মেয়ে এসে বিষম কষ্ট হয়েছে। মুখে অবশ্য দিদি কিছুই বলেননি কিন্তু কষ্ট ত তিনি নিজেই চোখে দেখতে পাচ্ছেন। তাছাড়া এখান থেকে বিয়ে দেওয়া একেবারে অসম্ভব—পাত্রপক্ষও সেকথা বলে

দিয়েছে। তারা বলেছে এখানে আসতে গেলে পঁচিশটি লোকের আসাযাওয়ার গাড়ী ভাড়া দিতে হবে সেকেন্ড ক্লাসের। আর সেই যখন আসতে হবেই কলকাতায়—

অবশ্য পাড়াটা ভাল নয় নাকি। জামাইবাবু বললেন 'বাবা, সুরেশ আর বাড়ী পেলে না, একেবারে সোনাগাছির ধারে।'

পরে আবার উনিই বললেন, 'অবশ্য করবেই বা কি। কলকাতায় বাড়ী পাওয়া আজকাল যা হাঙ্গামা।...আর শুনেছি আজকাল ওপাড়া থেকে সব উঠিয়ে দিয়েছে...এখন বহু ভদ্র-লোকই ওখানে বাস করে। তবে বাড়ী খুব পুরোনো হবে তা বলে রাখছি। ঐ হ'ল খাস বনেদী কলকাতা। আদিম কলকাতাও বলতে পারো...একশ বছরের কম বোধ হয় বাড়ীই নেই।...যাক্...দুর্গা বলে এই শুভকাজটা ত সারো তারপর দেখা যাবে। আর একটা বাড়ী দেখেশুনে নিলেই হবে।'

অনিলা বিদেশে মানুষ। বিহারে ওর জন্ম, বিয়ে হয়েছিল বর্ম্মায়। সেখান থেকে ওঁর স্বামী কুষ্ঠিয়ার কাছে (ঐখানেই ওদের পৈত্রিক বাড়ী ছিল) জমিজমা কিনে বিরাট বাড়ী তৈরী করেন। ইচ্ছা ছিল রিটায়ার করে দেশে এসে বাস করবেন। তাঁর সে সাধ মিটল না বটে কারণ তার আগেই তিনি মারা গেলেন কিন্তু তাঁর ইচ্ছাটা অনিলা ভোলেন নি। বর্ম্মার বাড়ী-ঘর বেচে কিনে একাই দেশে এসে উঠেছিলেন। অবশ্য ঠিক সময়েই উঠেছিলেন, আর কিছু দেরি হলে নিরাপদে আসতে পারতেন না। যুদ্ধ বেধে গিয়েছিল প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই।

দেশ থেকেই তিনি তাঁর সপত্নীকন্যার বিয়ে দেন সুরেশের সঙ্গে। সুরেশ আলিপুরের উকীল...বাগবাজার অঞ্চলে বাড়ী;

বস্তুত এখন অভিভাবক বলতে সুরেশই ও'র ভরসা। ও'র নিজেরও তিনটি মেয়েই বড়...সর্বশেষ সন্তান ছেলে, সেটি এই সবে বছর দশেকের।

দুর্ভাগ্যের সঙ্গে যুঝে যুঝে অনিলা অনেক শক্ত হয়েছিলেন বৈকি! চারটি মেয়ে নিয়ে দেশে এসে উঠে অনেক বিপদেই ত পড়েছিলেন, শক্ত না হলে কাটিয়ে উঠতে পারতেন না। বিধবার হাতে কিছু টাকা বা সম্পত্তি আছে জানলে সবাই তা ফাঁকি দিয়ে নেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠে...আত্মীয়রাই তার মধ্যে প্রধান। যত নিকট আত্মীয় তত বেশী শত্রু হয় তখন। অনিলাকে একা সেই সব প্রতিকূলতার সঙ্গে যুঝতে হয়েছিল। কিন্তু এমনই ভাগ্য সমস্ত বিরুদ্ধতাকে জয় করে যখন সবে একটু নিশ্চিন্ত হয়েছেন পাকিস্তান হয়ে গেল ও'র দেশ। উনি ব্যাপারটা কি হবে অনুমান করে কতক কতক বিক্রী করতে শুরু করেছিলেন কিন্তু সব হস্তান্তর করা হয় নি। কোন মতে গহনাপত্র টাকাকড়ি নিয়ে যে পালিয়ে আসতে পেরেছেন এই ঢের জমিজমা বাড়ী মায় আসবাব পত্র সবই ফেলে রেখে আসতে হয়েছে।

সুতরাং—যা বলছিলুম, কলকাতা সম্বন্ধে কোন ধারণাই নেই অনিলার—এই প্রথম তিনি এলেন। তবু যে অবস্থা এসে দেখলেন বাড়ীর, ঠিক এমনটা তিনি আশঙ্কা করেন নি, জামাইবাবুর মুখে পাড়ার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে সতর্কবাণী বলা সত্ত্বেও না।

সুরেশও একটু অপ্রতিভ হ'ল। তার খুব বেশি দোষ ছিল না অবশ্য, সে আশা করেছিল ওর শাশুড়ী এবং শালীরা

ষ্টেশন থেকে সোজা তাদের বাড়ীতে গিয়েই উঠবেন তারপর স্নানাহার ক'রে সুস্থ হয়ে বিকেলের দিকে ওদের বাসাতে গেলেই চলবে। ততক্ষণে ওদের চাকর মালপত্র নিয়ে সেখানে গিয়ে বাড়ীটা ধুয়ে মুছে কতক কতক মালপত্র গুছিয়ে রাখতে পারবে। অর্থাৎ বাসাটা চলনসই হয়ে উঠবে।

কিন্তু অনিলার মধ্যে সেকালের হাওয়াও কিছু ছিল। ওঁদের কতকগুলো আভিজাত্যের আইন আছে, তাতে জামাই বাড়ী যাওয়া নিষেধ। তিনি কিছুতেই রাজী হলেন না যেতে। বললেন, 'ওদের নিয়ে যেতে চাও নিয়ে যাও কিন্তু আমাকে আর ও অনুরোধ ক'রো না বাবা। আমি বরং রামটহলকে নিয়ে গিয়ে বাড়ীঘর গুছিয়ে ফেলি, ওরা সেই সন্ধ্যের সময় চলে আসবে 'খন্। টেঁপুর সঙ্গেই আসতে পারবে।' টেঁপু অর্থাৎ ওঁর স্বামীর প্রথম পক্ষের কন্যা, সুরেশের স্ত্রী। তিনিই ওকে মানুষ করেছেন—নিজের মেয়ে বলেই মনে করেন।

তাই হ'ল। সুরেশের ভাইও ছিল ষ্টেশনে। তার সঙ্গে মেয়েরা চলে গেল। উনি, সুরেশ আর রামটহল মালপত্র নিয়ে এসে উঠলেন উত্তর কলকাতার একদা জমজমাট এখন মৃতপ্রায় এই বিশেষ অঞ্চলের বাড়ীটিতে।

কিন্তু এ কী অবস্থা !

কতকাল যে এ বাড়ীতে কেউ ঢোকেনি তা বলা শক্ত। উঠোনে বহু দিনের আবর্জ্জনা জমে জমে বৃষ্টির জলে তার ওপর বড় বড় আগাছা জন্মে গেছে। ঘরগুলোর দোর জানালা খোলা হা হা করছে। ঘরে চুন পড়া দূরে থাক্, এর আগের ভাডাটিয়ারা বহুকাল আগে চলে গেছে, তাদের পরিত্যক্ত সে সব জঞ্জালও সাফ্ করা হয়নি। কোন কোন ঘরের মেঝের

৩

উপরেই ঘাস ও অশথ চারা গজিয়ে উঠেছে। জানলার কপাটে রেলিংএ রং করা হয়নি বোধ হয় বাড়ী তৈরী হবার পর থেকে একবারও। সেগুলো ভাল ক'রে বন্ধ হয় না—কোন জায়গায় পাল্লা ঝুলে পড়েছে কব্জার বন্ধন শিথিল করে।

কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে সেদিকে তাকিয়ে থেকে অনিলা বললেন, 'এ কোথায় আনলে বাবা, এযে ভূতের বাড়ী।'

সুরেশ মাথা চুলকে বললে, 'তাই ত মা। বাড়ীওয়ালার সব ক'রে আমাকে চাবি পৌছে দেবার কথা ছিল। কাল সকালে ওর লোক দিয়ে যখন চাবি পৌছে দিলে তখন আমি আদালতে বেরুচ্ছি। তারপর আর সময়ও হয়নি। তাছাড়া আমি একবারও ভাবিনি যে এমন করে ঠকাবে আমাকে। লোকটা মাতাল বটে—তবু, এগুলো ত বাড়ী ভাড়া দেওয়ার সাধারণ নিয়ম।'

'তা বটে বাবা, তোমার আর দোষ কি? কিন্তু এই বাজারে এতকাল এ বাড়ী খালিই বা আছে কেন?'

'একে ত এসব পুরোনো পাড়ায় কেউ আসতে চায় না, তায় বাড়ীর এই দশা! সেই জন্যেই বোধ হয় ভাড়াটে জোটেনি। বাড়ীওয়ালাও ত দেখছেন কেমন...মদ খেয়ে পড়ে থাকে, বাড়ীঘর সারালে ত লোকে পছন্দ করবে।'

তা বটে!

অনিলা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে কাজে লেগে গেলেন। রামটহল দেহাত থেকে আমদানী করা বিহারী চাকর...খাটতে পারে, এখনও ফাঁকি দেবার কৌশলটা শেখেনি। কিছুক্ষণের মধ্যেই চলনসই হয়ে উঠল বাড়ী ঘর...যদিও রামটহল দুটো বিছে এবং একটা সাপ মারল আবর্জ্জনা স্তূপের মধ্যে থেকে,

সেজন্য আতঙ্ক একটা থেকেই গেল সুরেশের। সে লজ্জিত-ভাবে বার বার অনিলাকে প্রতিশ্রুতি দিল যে কালই অন্তত চুনকাম করার ব্যবস্থা সে নিজেই করে দেবে। আর বাড়ীওয়ালাকে দেখে নেবে সে একবার! পাজী নচ্ছার বদমায়েস!

বিয়েটা পর্যন্ত নির্ব্বিঘ্নে চুকে গেল। তাড়াহুড়োর মধ্যে কোনমতে ওপরের ঘরগুলোর চুন ফিরিয়ে চলনসই ক'রে নেওয়া হয়েছিল। নিচেটা করবার সময় হয়নি। সুরেশ বলেছিল, বিয়েটা চুকে যাক্...একটা ভাড়াটে ঠিক করি, তখন করিয়ে নিলেই হবে। কিন্তু এখানে যে ভাড়াটে হঠাৎ ঠিক হওয়া শক্ত তা এই কদিন কলকাতা এসেই অনিলা বুঝেছেন। সরু গলি...দিনের আলো গলিতে পাওয়া যায় সারাদিনে চার পাঁচ ঘণ্টা। পাড়ার বাড়ীগুলো কোনোটাই একশ বছরের কম নয়---জামাইবাবু যা বলেছেন---এ বাড়ীও সেই দলে। মোটা মোটা দেওয়াল ভিজে স্যাঁতস্যাঁত করছে, কেমন একটা চাপা ভ্যাপসা গন্ধ, নিচের ঘর গুলোয় আলো-বাতাসও বিরল। এতে কে আসবে মোটা টাকা ভাড়া দিয়ে?

অনিলা বললেন, 'ও বন্ধই থাক্। আমার এতগুলো ঘরে দরকার কি? ওর পেছনে আর খরচ কর'তে চাই না।'

সুরেশ কেবল তাঁকে আশ্বাস দেয়, 'আপনি বোঝেন না মা। লোকে মাথা গুঁজে দাঁড়াবার মত স্থান পাচ্ছে না, এখন কি অত বাছ-বিচার করবার সময়?'

'তা হোক বাবা। আমার আর লাভ করে দরকার নেই। তুমি বরং তাড়াতাড়ি একটা অন্য বাড়ী দ্যাখো। দুখানা ঘর

হলেই আমার চলে যাবে—'

বিরস মুখে সুরেশ বলে, 'ভাল বাড়ী পাওয়া কি অত সোজা মা ! দেখি—'

কিন্তু তাড়া কোন পক্ষেই খুব বেশী দেখা যায় না। ওরা একরকমে আছে, পথে ত দাঁড়িয়ে নেই, এই ভেবে সুরেশ গড়িমসি করে। আর অনিলাও খুব বেশি তাড়া দেন না —কারণ ওপরের ঘরগুলোয় আলো বাতাস মন্দ নেই। বাস করাটা একেবারে অসম্ভব নয়।

হয়ত এমনিই চলত যদি না তাড়াটা অপ্রত্যাশিত ভাবে অন্য জায়গা থেকে আসত।

টেঁপিরা যে কদিন ছিল—বাড়ীটা তবু সরগরম ছিল কিছু, ওরাও চলে যেতে নিচের তলাটা একটু গা ছম্‌ছমে হয়ে উঠল। কাজেই রামটহল যখন এসে জানালে যে ওর চৌকিটা ধরে রাত্রে কে যেন নাড়া দেয় ওরা, অনিলা হেসেই উড়িয়ে দিলেন। নিচে একা থাকতে ওর ভয় করে—আসল কথাটা তাই। নানারকম কল্পনা করে সে।

কিন্তু একদিন আর উড়িয়ে দেওয়া চলল না।

হঠাৎ নিচে হৈ-চৈ ক'রে চেঁচিয়ে উঠতে অনিলা মধ্যরাত্রে উঠে এসে দেখলেন ভারী তক্তাপোষ সুদ্ধ কাৎ করে রামটহলকে কে ফেলে দিয়েছে। সব নিচে রামটহল, তার উপর বিছানা, তার উপর তক্তাপোষ। এই সবে রামটহল বেরিয়ে এসেছে সেই স্তূপের মধ্যে থেকে।

অনিলা ছেলেবেলা থেকে বিদেশে ঘুরছেন, তাঁর সাহস কম নেই। তাঁরও কেমন একটা খট্‌কা লাগল। তবু তিনি বোঝাতে চেষ্টা করলেন যে, স্বপ্ন সঞ্চরণ বলে এক রকম রোগ

আছে তাতে ঘুমের মধ্যেই উঠে রোগী নানারকম অদ্ভুত অদ্ভুত কাজ করে বেড়ায়।

রামটহল তার জবাবে সোজা কথাটাই বললে, 'মা, আমি ও চৌকী আমার পিঠের উপর ফেলব কি ক'রে' ?

তা বটে।

রামটহল হাত জোড় করে বললে, 'মা আমাকে ছুটি দাও। এ বাড়ী থাকলে আমি মরে যাবো।'

অনিলা বললেন, 'বেশ ত, তুমি না হয় আজ থেকে দোতালাতেই শোও। ভাঁড়ার যে ঘরে থাকে সে ঘরে ত ঢের জায়গা—'

রামটহল প্রবল বেগে ঘাড় নাড়াল। এ বাড়ীর সংস্পর্শে আর না। নেহাৎ গুরুবলে প্রাণটা বেঁচে গেছে। আবার এই বিপদে যায় কেউ ?

অনিলার অনেক অনুনয়ে বিনয়ে শেষ পর্য্যন্ত সে এই বন্দোবস্তে রাজী হ'ল যে সারা দিন সে কাজ করবে, সন্ধ্যার পরও আলোটালো জ্বেলে কিছুক্ষণ না হয় থাকবে কিন্তু রাত্রে এখানে সে থাকবে না কোনমতেই। বিডন ষ্ট্রীটে তার এক দেশোয়ালীর খাবারের দোকান আছে সেইখানেই রাত্রে শোবে—আবার ভোরে আসবে।

অগত্যা রাজী না হয়ে উপায় কি ?

সুরেশকে চিঠি লিখে ব্যাপারটা জানালেন অনিলা। সে এসে দেখা করে বলে গেল, 'ব্যাটা মেড়ো ভূত, তার আর কত ভাল হবে। একেবারে খাঁটি দেহাতী ধরে এনেছেন ! যা হোক—দু চারটে দিন চালিয়ে নিন্। আমি বাড়ীও দেখছি আর চাকরও যদি একটা পাই—'

এর দিন তিনেক পরেই রেখা শ্বশুর বাড়ী থেকে ফিরল। তারপরের শনিবার যথারীতি অনিলা নিমন্ত্রণ করে আনালেন জামাইকে। আমোদে-আহ্লাদে হাসি-তামাসায় বহু রাত হয়ে গেল। খাওয়া-দাওয়া সেরে ওদের শুতে পাঠিয়ে নিচের দোর দিয়ে এসে যখন অনিলা শুতে গেলেন তখন রাত একটা বাজে।

তবু ওঁর ঘুম এলনা কিছুতেই। কেন তা বুঝতে পারেন না। হাড়ভাঙ্গা খাটুনি গেছে সারাদিন, এক হাতে সব কিছু করতে হয়েছে, ভাল ভাল খাবার তৈরী করেছেন জামাইয়ের জন্য। তবু কেন ঘুম আসে না ?

ঘণ্টাখানেক এপাশ ওপাশ করে বিরক্ত অনিলা উঠে পড়লেন। মাথায় বোধ হয় একটু জল দেওয়া দরকার। সারা-দিন আগুন তাতে থেকে মাথা গরম হয়ে উঠেছে। কিন্তু দরজা খুলে বাইরে বেরোতেই যে দৃশ্য তাঁর চোখে পড়ল তাতে তিনি অবাক্। রেখা তার ঘরের বাইরে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। দোরটাও ভেজানো তারই একটা কপাটে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে রেখা।

তবে কি জামাই কোন কারণে রাগ ক'রে বার করে দিয়েছে রেখাকে ? প্রথমেই মনে হল ওঁর। কিন্তু সে যে অবিশ্বাস্য। সে যুগ হ'লেও না হয় সম্ভব হ'ত। তাছাড়া কন্যা জামাতার অসাধারণ প্রণয়ের ইঙ্গিতই তিনি পেয়েছেন এক দিনে।

তবে ?

নিশ্চয় রেখাই রাগারাগি করে বেরিয়ে এসে দাঁড়িয়ে আছে।

এসব আবার কি। রাগ হ'ল অনিলার। তিনি চাপা গলায় ডাকলেন, 'এই শোন্ এদিকে।'

কিন্তু রেখা নিশ্চল। সাড়াও দিলে না।

'ও আবার কি ঢং। রাতদুপুরে কেলেঙ্কারী।' চাপা গলাতেই তর্জ্জন করেন অনিলা, 'শুতে যা না, কী হচ্ছে কি !'

ঐ দিকেই এগোন তিনি। কারণ বারান্দাটা কোণাকুণি-ভাবে ওঁর ঘরের সামনে থেকে সমকোণে বেঁকে ঐ ঘরের সামনে দিয়েই দোতালায় কলঘরের দিকে গেছে। কিন্তু তিনি যত এগোন রেখাও তত পেছোয়। বিরক্তি বেড়ে যায় অনিলার। বুড়ো হাতী মেয়ের এ সব কী আদিখ্যেতা। অবশ্য হাসিও পায়—কোথায় পালাবে সে, ওদিকে ত বাথরুমেই শেষ। বেরোবার কোন দরজাও নেই।

'এই পোড়ারমুখী, শোন্ না। হ'ল কি তোর ?'

সাড়া নেই। ততক্ষণে সে ঢুকে গেছে বাথরুমে।

অনিলা একটু দ্রুতপদেই যান। বাথরুমের দরজাটা ভাল ক'রে খুলে হাত বাড়িয়ে সুইচটা টিপে দেন।

কিন্তু কোথায় কে ! বাথরুম একেবারে শূন্য।

ছোট্ট বাথরুম, কোনদিকে আর কোন পথ নেই নির্গমনের—বারান্দাও এত সংকীর্ণ, গেলে ওঁকে ধাক্কা মেরেই যেতে হবে। মেয়েটা গেল কোথায় ?

অথচ তিনি ত স্পষ্টই দেখেছেন রেখাকে। মুখটা অবশ্য ভাল ক'রে দেখা যায়নি কিন্তু সেই গঠন, সেই নীল রঙের শাড়ী, তেমনি দাঁড়িয়ে থাকবার ভঙ্গী—

মাথায় জল দেওয়া হ'ল না। পা পা করে পিছিয়ে এসে—যা করতে নেই শাশুড়ীকে, তাই করলেন—জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখলেন ঘরের মধ্যে। আলো নিভানো তবু রাস্তার

গ্যাসের আলোর একটা রেখা ঘরের দেওয়ালে এসে পড়ে বিছানাটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে—তাঁর কন্যা জামাতা পরস্পরকে জড়িয়ে অগাধে ঘুমোচ্ছে।

মৃদু ঠেলা দিয়ে দেখলেন দরজাও বন্ধ ভেতর থেকে।

তবে—কি তবে কি রামটহলের অনুমানই—! অজ্ঞাত একটা আতঙ্কে মন পূর্ণ হয়ে উঠল। ফিরলেন নিজের ঘরের দিকেই—চমকে চেয়ে দেখলেন তাঁর ঘরের সামনে তেমনি-ভাবে সেই মেয়েটি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ঠিক রেখার মতই দেখতে—যেমন একটু আগে দেখেছেন।

যত বড় সাহসীই হোন, এবার অনিলা অনুভব করলেন যে তাঁর পা কাঁপছে, সর্ব্বাঙ্গ উঠেছে ঘেমে।

তবু—ওঘরে তাঁর যথাসর্ব্বস্ব...দুই মেয়ে ও ছেলে ঘুমোচ্ছে। মরীয়া হয়ে তিনি এগোলেন, মুখে অস্ফুটস্বরে রামনাম জপ করতে করতে—

মেয়েটিও একপা একপা করে পিছিয়ে এক সময় মিলিয়ে গেল।

নতুন জামাইকে কিছু এসব কথা বলা যায় না। সুরেশকে ডেকে পাঠিয়ে বলতে সে হেসে বললে, 'এ আমি তখনই ভেবে-ছিলাম মা। যতই হোক্ মেয়েছেলে ত, রামটহলের কথাটা যখন কানে গেছে তখন ভূত দেখবেনই একদিন না একদিন।—আসলে সারাদিন খাওয়া দাওয়া হয়নি—আগুনতাত, একটু—কী বলব—হিষ্টিরিয়ার মত। আচ্ছা—আমি উঠে পড়ে লাগছি একটা বাড়ীর জন্যে—'

এই বিদ্রুপটা দারুণ লাগল অনিলার। তিনি আর কিছু বললেন না। ঘরে একটা করে প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখার ব্যবস্থা

করলেন। পাঁচবাতির বাল্‌ব আনাতে পারলেই ভাল হ'ত কিন্তু তাতে একটা পয়েন্ট টান্‌তে হবে। কে করে সে সব হাঙ্গামা ?

দিন তিনেক পরে কিন্তু আবার তাঁর ঘুম ভেঙ্গে গেল। চোখ মেলে দেখলেন আলোটা নিভে গেছে, কিন্তু তখনও বাইরের আকাশে জ্যোৎস্নার আভাস থাকাতে একেবারে নিরন্ধ্র অন্ধকার জমাট বাঁধেনি ঘরে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মনে হ'ল, উঠে আলোটা জ্বালা উচিত। না হয় সারারাত ইলেকট্রিক আলোই জ্বলুক।

কিন্তু ওঠবার আগেই এক কান্ড ঘটল।

ওধারের জানালা দিয়ে রাশি রাশি পেঁজা তুলো ঘরে এসে ঢুকতে লাগল বাতাসে। প্রচন্ড ঝড়ের মুখে যে ভাবে আসে তেমনি সজোরেই উড়ে আসতে লাগল...অথচ...অনিলা কানপেতে শোনেন বাইরে কোথাও বাতাসের শব্দ পর্যন্ত নেই, ঝড় ত দূরের কথা। অনিলা ভয়ে অভিভূত হয়ে চেয়েই রইলেন খানিকটা, তারপর সন্তানদের বিপদ স্মরণ ক'রে যেন অকস্মাৎ মরীয়া হয়ে উঠলেন, একটা আর্ত্ত চাপা চিৎকার করে লাফিয়ে উঠেই সুইচটা টিপে দিলেন।

ছেলে মেয়েরা শান্ত ভাবেই ঘুমোচ্ছে, বাতাস নেই, তুলো আসাও বন্ধ হয়েছে। ঘরে বাইরে প্রকৃতি শান্ত ও স্তব্ধ।

আলো জ্বালার সঙ্গে সঙ্গেই ভয়ও চলে যায়। অনিলার মনে হয় আগাগোড়া কি স্বপ্নই দেখছেন তিনি ? একটু হাসেনও বোধহয় অপ্রতিভভাবেই...আপন মনেই। কিন্তু তারপরেই কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন...ঐ ত বিছানার চার পাশে পেঁজা কাপাস তুলো ছড়ানো। হাতে করে ছুঁতে ভরসা হয়

না বটে...চোখে যতটা দেখা যায় তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

বাকী রাতটা সেই এক ভাবেই জেগে কাটিয়ে দেন অনিলা। শুতেও ভরসা হয় না—পাছে চোখ বুজে আসে তন্দ্রায়। মনে মনে স্থির করেন ভগ্নীপতি রাগই করুন আর যাই-ই করুন ভাগলপুরেই ফিরে যাবেন তিনি। ছেলেমেয়েরা ইস্কুলে এখনও ভর্ত্তি হয়নি, গরমের ছুটির পরই হবে এমনি কথা আছে। এ ক্ষেত্রে একেবারে ভাগলপুরে গিয়েই ভর্ত্তি করে দেবেন। কলকাতার মোহে আর কাজ নেই।

মেয়েদের কিন্তু ভরসা করে কিছু বলতে পারেন না। তুলোগুলো নিজেই ঝাঁট দিয়ে ফেলে দেন। দিনের আলোর সঙ্গে সঙ্গে সাহসও ফিরে আসে অনেকটা। রামটহলকে পাঠান পুরোহিতের কাছে, যে পুরোহিত রেখার বিয়ে দিয়েছিলেন...তাঁকে ডাকিয়ে এনে ফরমাস দেন তিনটে রাম কবচের। মোটা প্রাপ্তিযোগের সম্ভাবনায় হৃষ্ট পুরোহিত তিন দিন সময় নিয়ে চলে যান।

কিন্তু ইতিমধ্যেই একটা অঘটন ঘটে গেল...

অপরাহ্ণের সঙ্গে সঙ্গেই ওঁরা ছাদে উঠে বসেছেন। রান্নার কাজ সেরে ফেলেন অনিলা বেলাবেলিই। রামটহল বাসনমাজা শেষ করে নিচের কলতলায় স্নান করছে। এই সময় এসেছে সুরেশ, আদালতের ফেরৎ ওদের খবর নিতে।

রামটহল ওকে দেখেই আঙ্গুল দিয়ে ছাদের দিকটা দেখিয়ে দিলে। অর্থাৎ সবাই ওখানে। সুরেশও ঘাড় নেড়ে জুতো খুলে ওপরে উঠে গেল। ডাকবার প্রয়োজন নেই, ছাদে উঠে সবাইকে চমকে দেবে...এই উদ্দেশ্য। কিন্তু দোতলায় উঠেই

দেখলে শোবার ঘরের চৌকাঠ ধরে রেখা দাঁড়িয়ে আছে, হাসি হাসি মুখে।

সন্ধ্যা তখনও হয়নি। ছাদে দিনের আভাস এখনও লেগে—আলো জ্বালবার তখনও দেরি আছে, এমনি সময় সেটা। তবু একটা ঘোর ঘনিয়ে এসেছে পুরোনো বাড়ীর দেওয়ালের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। কিন্তু এমন অন্ধকার হয়নি যে ঝাপ্‌সা হয়ে যায় দৃষ্টিটা—সুরেশ ভাল করেই দেখল রেখাকে। সামনে থেকে পুঙ্খানুপুঙ্খ দেখা হয়ত নয়...তবু পরিচিত মূর্ত্তির সমস্ত রেখা ও মিলিয়ে পেয়েছে সেই দেখাতে।

'কী গো...মেজগিন্নি যে। তুমি একা এখানে ? বিরহে ম্লান হয়ে আমার পায়ের আওয়াজে কর্ত্তার আওয়াজ বলে ভুল করেছিলে বুঝি ?'

রেখা কথা কইলে না। মনে হ'ল একটু হাসল সে।

কথা কইতে কইতেই এগিয়ে যায় সুরেশ। রেখাও পিছিয়ে ঘরে গিয়ে ঢোকে।

'কথা কইছ না যে ! আশাভঙ্গের ঝালটা আমার ওপর পড়ল নাকি ? আমি কি করব বলো, আমার ওপর রাগ ক'রে কি হবে ? আরে, গেলে কোথায় ? উবে গেলে নাকি ?'

সত্যি ত...কোথায় গেল রেখা ?

কোথাও ত নেই। ঘরে তিনটে ট্রাঙ্ক আর পাতা বিছানা। অনিলার কাপড়। এমন আসবাব নেই যে তার আড়ালে লুকোবে।

এই প্রথম একটা খট্‌কা লাগল সুরেশের। তবু সে হাত বাড়িয়ে সুইচটা টিপে দিলে। না—রেখার চিহ্নও নেই কোথাও। অথচ এই একটা দরজা...বেরোবার কোন দ্বিতীয়

পথও ত নেই।

অব্যক্ত অস্ফুট একটা শব্দ ক'রে সিঁড়ি দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠল সুরেশ।

ছাদে সবাই ওরা বসে আছে। একটা থালায় মুড়ি মাখা তেল দিয়ে, মেয়েরা গোল হয়ে বসে খাচ্ছে। অনিলা একটু দূরে বসে কি সেলাই করছেন।

'রেখা !'

প্রায় আর্ত্তনাদ ক'রে ওঠে সুরেশ। 'কী জামাই বাবু ? কি হয়েছে ?'

'তুমি কি এখানেই ছিলে এতক্ষণ ? না, নিচে ছিলে ?'

'না ত—আমি এখানেই আছি।'

চোখের নিমেষে অনিলা উঠে দাঁড়াল।

'সুরেশ, বাবা একবার নিচে চলোতো ! জরুরী কথা আছে।'

ইঙ্গিতটা বুঝতে পারে সুরেশ, নিজেকে সামলে নিয়ে নেমে আসে নিচে।...অনিলা হেসে প্রশ্ন করেন, 'আজ তাহলে নিজে চোখেই দেখলে বাবা ?

সুরেশ হেঁট হয়ে ওঁর পা ছুঁয়ে বলে, 'আমাকে মাপ করুন মা। আজই চলুন আমার ওখানে। আমি কাল যেমন ক'রে হোক্ বাড়ী খুঁজে আপনাকে তুলে দেব। মালপত্র এমনিই থাক্...'

অনিলা বলেন, 'দেড়মাস আমি ঘর করছি বাবা ওর সঙ্গে. একদিনে কি এসে যাবে। তুমি কালই ব্যবস্থা ক'রো তাহলেই আমি নিশ্চিন্ত হই।'

'ছি ছি ! কী অপরাধ করেছি মা। যদি বিপদ আপদ

হ'ত কিছু ইস্ !'

অনুতাপের শেষ থাকে না সুরেশের।

সুরেশ আবারও অসাধ্যসাধন করলে। ঢাকুরিয়া অঞ্চলে একটা দু-কামরা বাড়ী খুঁজে বার করলে সে রাতারাতি। পরের দিন লরী ডেকে যখন মালপত্র তোলা হচ্ছে সামনের বৃদ্ধ খাবারও'লা একপা একপা করে এগিয়ে এল সদরের মধ্যে। অনিলা দাঁড়িয়ে মালের তদারক করছিলেন। জোড়হাতে তাঁকে এক নমস্কার ক'রে বললে, 'চললেন মা ?...আবার কিছুকালের জন্যে নিশ্চিন্দি।...যাহোক আপনার বুকের পাটা মা, এই বাড়ীতে তবু দেড়মাস কাটালেন ত। আর কেউ পারেনি।'

অনিলা যেন আঁধারে কূল দেখতে পান।

'তুমি জানতে বাবা ?'

'জানতুম বৈকি মা। আমি কি আজকের লোক। চাল্লিশ বছরের দোকান আমার। আমি ও ঠাকরুণটিকে জ্যান্ত দেখেছি যে !'

সুরেশ রুষ্ট কণ্ঠে বললে, 'তুমি জানতে তবু বলনি আমাদের ?'

'আপনারা যে জানতেন না তাই বা কেমন ক'রে জানব বাবু। এ পাড়ায় ত সবাই জানে। আমি ভাবলুম যে জেনেশুনেই নিয়েছেন সাহস ক'রে। আপনারা একেলে লেখাপড়া জানা লোক, আপনাদের বোধ হয় পেত্নীও ভয় করে !' ওষ্ঠে চাপা বিদ্রূপের হাসি বুড়োর।

অনিলা ইঙ্গিতে ওকে একপাশে ডেকে আনেন।

'ব্যাপারটা কি বাবা বলো ত ?'

'ব্যাপার কি জানেন মা...দত্তমশাই এখন যিনি মালিক, ওনার দাদার ভাগে ছিল এবাড়ী। তিনিই থাকতেন এখানে। পুলিশে কাজ করতেন---মদ আর মেয়ে মানুষ ক'রে ক'রে সে চাকরী যায়, তবু অভ্যাস ছাড়তে পারেন নি। টাকার লোভে ঐ ভাল মানুষের মেয়েটাকে বিয়ে করেন কিন্তু ফিরে তাকাননি কোনদিন ওর দিকে। বেচারা একা থাকত। আগে এক ঠিকে ঝি কাজ ক'রে দিয়ে যেত—তিন মাসের মাইনে বাকী পড়ায় সেও ছেড়ে দিল। ভাড়াটে টিকতনা, এমনই সুনাম ছিল কর্ত্তার। শেষে বৌটা না খেয়ে খেয়ে কি অসুখে পড়ল—পড়েই আছে, আটদিন বাবুর পাত্তা নেই। কি করতে আসবে মা, সোনারত্তি ত' রাখেনি গায়ে।...শেষে যেদিন এল, দরজা ভেঙ্গে ভেতরে ঢুকতে হ'ল—দেখে কতদিন ম'রে পড়ে আছে, পিঁপড়াতে অর্দ্ধেক খেয়ে শেষ করেছে। কোন মতে বাকী দেহটা তুলে ত পুড়িয়ে দিলে—না শ্রাদ্ধ না কিছু। কিছুদিন পরে ভাইকে বাড়ী বেচে দিয়ে কর্ত্তা উধাও হলেন কিন্তু ঠাকরুণটি সেই থেকে রয়েই গেলেন। অনেক ভাড়াটে এসেছে মা, কেউই তিন দিনের বেশি থাকতে পারেনি। এবার আপনাদের এতদিন থাকতে দেখে ভাবলুম যে বুঝি ঠাকরুণ কোথাও গেছে।'

তারপর একটু দম নিয়ে বললে, 'শুধু কি ভাড়াটের ওপর উপদ্রব মা একদিন হয়ত কুল্‌ফি বরফ ওলাকে ডেকে বসল, আবার কোনদিন বা বাসনউলিকে। সকলে নিশ্চিন্ত হয়ে ঢোকে—পোড়ো দেখে ভেতরে ঢুকে ব্যাপারটা বুঝে চিৎকার করতে করতে বেরিয়ে আসে। একদিন একটা মেয়েছেলেকে ডেকেছে তার ত দাঁত কপাটি লেগে একেবারে যায় যায় অবস্থা।

অতি কষ্টে তার জ্ঞান করি। এই আমার এক চাকরী।'

অনিলা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। হতভাগিনীর অন্তরের অতৃপ্ত তৃষাটা যেন তিনি দেখতে পাচ্ছেন পরিষ্কার।

অনেকক্ষণ পরে তিনি বললেন, 'একটা কাজ করতে পারবে বাবা!'

'কেন পারব না মা—বলুন।'

'তুমি একটি ব্রাহ্মণ ডেকে এই ভিটেতে তুলসী দেওয়াতে পারো?'

'আপনি কেন দেবেন মা, যার বাড়ী তার যদি হুঁস না হয়—'

'তাহোক বাবা। তাতে দোষ নেই। এই বারোটা টাকা রাখো। আমাদের ত এখনও ভাড়া দেওয়া আছে। চাবী তোমার কাছেই রাখো। আমার জামাই এসে খবর নিয়ে যাবেন'খন্—যদি বেশি লাগে ত তাও দেবেন। দোহাই বাবা, এই কাজটি করিয়ে দাও।'

'আচ্ছা তাই হবে মা। আপনার জন্যেই ওর আত্মাটা বোধহয় এতকাল বসে ছিল।'

...অনিলা বেরোবার আগে বাড়ীটার দিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। এতকাল ছিল ভয়—আজ যাবার আগে অভাগিনীর জন্য মায়াই বোধ হয় তাঁর। অপরিসীম বেদনায় মনের ভেতরটা যেন টন্ টন্ করতে থাকে।

রহস্য

রাণু বৌদি আর আমি প্রায় সমবয়সীই ছিলুম। ওঁর যখন বিয়ে হয় তখন আমার বয়স ছিল সতেরো-আঠারো, ওঁর ষোল-সতেরো। হয়তো সেই জন্যই আমাদের দু'জনের অত সহজে ভাব হয়ে গিয়েছিল।

ওঁর বিয়ে থেকেই শুধু নয়—বিয়ের আগে থেকেই ওঁকে দেখছি। দূর সম্পর্কের পিসতুতো ভাই, তারই বিয়ে—তাতে আমাদের অত জড়িয়ে পড়ার কথা নয় কিন্তু কেষ্টদার ওদিকে আর আপনার লোক কেউ ছিল না। পিসীমা বিধবা মানুষ, ছেলেও তেমন রোজগার করে না সুতরাং পাত্রী পাওয়া তখনকার দিনেও দায় ছিল। যদি-বা পাত্রী একটা পাওয়া গেল ত সমস্যা দাঁড়ালো, দেখতে যায় কে? পিসীমা নিজে যেতে রাজী নন্, ছেলেকেও পাঠাতে চান্ না—ওপক্ষে তেমন আর কেউই নেই যে যায়। আমার দাদাদের খোশামুদি করে দেখলেন, তাঁরাও ব্যস্ত। ছিল তাঁর এক বেকার ভাগ্নে, তারও আকৃতি-প্রকৃতি ভাল নয়। তবু তাকেই পাঠাতে হ'ল বলে মায়ের অনুমতি নিয়ে আমাকে পাঠালেন তার সঙ্গে। যুক্তি দিলেন, 'একটা অন্ততঃ মানুষের মত চেহারার লোক ত যাওয়া চাই, নইলে তারা মনে করবে কি? ভদ্রলোক বলে বুঝতেই পারবে না যে!'

অবশ্য বিনয় বজায় রেখেও এটা স্বীকার করতে বাধা নেই, চেহারাটা আমার খুব সুন্দর না হলেও ভদ্রলোকের মতই ছিল—তাছাড়া খুব লম্বা-চওড়া গড়নের জন্য সেই বয়সেই মুরুব্বি মুরুব্বি দেখাত।

সুতরাং গেলাম। অজ পাড়াগাঁয়ে গরীবের ঘর। চালে খড় নেই, পরনে বস্ত্র নেই, এমন অবস্থা কিন্তু তারই মধ্যে রাণুবৌদি বেরিয়ে এলেন পঙ্কের মধ্যে পঙ্কজার মত—শতদল পদ্ম যেন গোবরের মধ্যে ফুটে উঠ্‌ল।

বয়স অল্প হলেও একবার মাত্র সেদিকে তাকিয়ে এটা বুঝতে পারলাম যে এখানে আর সংশয়ের কোন অবসর নেই। তবু হয়ত একটু হাতে রেখে বলা উচিত ছিল কিন্তু তখনও অত বুদ্ধি হয় নি—ঝাঁ করে বলে বসলাম, 'মেয়ে আমাদের পছন্দ, আপনারা কাল গিয়ে পাত্র দেখে কথা পাকা করে আসুন !'

বাইরে বেরিয়ে পিসীমার ভাগ্নে রমানাথদা আমাকে দুশ' তিরস্কার করলেন—'তুমি যে ফট্‌ করে কথা দিয়ে এলে, মামীমা যদি নিজে দেখতে চান, যদি পছন্দ না করেন ? তা ছাড়া ওটা দেখায়ও খারাপ—বরপক্ষ কি আর এক কথায় রাজী হয়ে যাওয়া ভাল ?'

এসব ঘোর-প্যাঁচ বুঝিনা তখন—সুতরাং চুপ করে রইলাম, তবে এটুকু জোর তখনও মনে ছিল যে পিসীমাই দেখুন আর যে-ই দেখুন, পছন্দ হবেই ! বাড়ী ফিরতে পিসীমা নানা রকম জেরা করতে লাগলেন, তাঁকেও সেই কথা বললুম, 'এ মেয়ে যদি পছন্দ না হয় পিসীমা, তা'হলে নিজে হাতে আমার কানটা কেটে ফেলবেন, কিছু বলব না।'

পিসীমারও তখন অত বাছ-বিচার করার উপায় ছিল না, তিনি আমার ওপর ভরসা করেই কথা-বার্ত্তা পাকা ক'রে ফেললেন। রমানাথের একটু খুঁৎ-খুঁতুনি ছিল কিন্তু কিসের যে আপত্তি তাও পরিষ্কার করে বলতে পারলে না।

এমন কি বিয়ের কথা যত পাকা হয়ে এল ততই সে যেন সরে দাঁড়াতে লাগল (বিয়ের পর কনে দেখে আমার দাদারা বলাবলি করেছিলেন—কানে গিয়েছিল যে ওটা ওর স্রেফ ঈর্ষা)— ফল হ'ল এই যে বিয়ের সব কথা-বার্ত্তা এমন কি বাজার-হাট পর্য্যন্ত সমস্ত ভার আপনা থেকেই আমার ওপর এসে পড়ল। এক কথায় আমিই এক ছোট-খাটো বরকর্ত্তা হয়ে উঠলুম।

সেই ভাবেই বিয়ে অবধি চলল। বর-যাত্রার আগে আমার হাতেই পিসীমা টাকা-কড়ি সব দিয়ে দিলেন, বর-যাত্রীদের আগ্‌লে নিয়ে যাবার ভারও পড়ল আমার ওপর।

পরে শুনেছিলুম রাণুবৌদির মুখে যে, কথাটা নাকি ওদের বাড়ীতেও ছড়িয়ে পড়েছিল এবং তা'নিয়ে হাসাহাসি আলোচনার শেষ ছিল না। একটি অকালপক্ক ছেলেই যে এ পক্ষের অভিভাবক এবং সে যে উৎকট গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে তার নবলব্ধ মর্য্যাদা বজায় রাখবার চেষ্টা করছে, এ কথাটা জেনে ওদের কৌতূহল ও কৌতুকের অন্ত ছিল না। বোধহয় কতকটা সেই জন্যে বিয়ের রাত থেকেই রাণুবৌদিকে আমার সঙ্গে কথা বলাতে পেরেছিলাম এবং ফেরবার পথে ষ্টীমারে ও ট্রেনে রীতিমত ভাবই হয়ে গেল। তাঁর নাকি একটি দেওরের সখ ছিলই মনে মনে, আমাকে পেয়ে তিনি বাঁচলেন।

এ বাড়ীতে বেশী লোক ছিল না, পিসীমা, কেষ্টদা আর পিসীমার এক বুড়ী-জা। সুতরাং এখানেও রাণুবৌদির আশ্রয় হয়ে উঠলুম আমিই—এমন কি যে সব কথা সমবয়সী ননদ ও জা'দের কাছেই বহু কষ্টে সঙ্কোচ দমন ক'রে বলে, সে সব কথাও এখানে আমাকে ছাড়া বলবার কেউ ছিল না।

বিয়ের চার-পাঁচটা দিন কিছু কিছু আত্মীয় সমাগম হয়েছিল কিন্তু তার মধ্যেও তেমন কেউ আপনার লোক হবার মত ছিল না। বিয়ের পর যখন ঘর-বসত করতে এলেন তখন ত কেউই নেই। সুতরাং অন্তরঙ্গতা একমাত্র আমার সঙ্গেই তাঁর গড়ে উঠল।

রাণুবৌদির একটা পরিচয় অল্পদিনের মধ্যেই পেয়ে আমি একটু অবাক হয়ে গেলুম। গরীবের ঘরের মেয়ে, তায় চির-কাল দূর পাড়াগাঁয়ে মানুষ, লেখাপড়ার কথা সেখানে কল্পনা করাই চলে না। বাড়ীতেই সামান্য একটু বাংলা লেখাপড়া শিখে, বোধ হয় খুব বেশী হবেত পঁচিশ-ত্রিশ খানা উপন্যাস পড়েছেন এ পর্য্যন্ত—চেয়েচিন্তে, অনেক কষ্টে। কিন্তু তবু এমন অদ্ভুত একটা রোমাণ্টিক মানসিক গঠন ছিল ওঁর, যা সহরের শিক্ষিত মেয়েদের মধ্যেও কম দেখেছি।

তেমনি উলটো ছিল কেষ্টদা। লেখাপড়া মোটেই শেখেনি (ছেলেবেলায় বাপ মরলে যা হয়), কোন এক ইলেকট্রিকের দোকানে সামান্য কী এক চাকরী করত—মিস্ত্রীদের সংসর্গে শুধু মুহুর্মুহুঃ বিড়ি খেতেই শিখেছে, কোন রকম সূক্ষ্ম মনোবৃত্তির ধার ধারত না সে। কথা ছিল অত্যন্ত কাঠখোট্টা ধরনের। চেহারাটাও দড়িপাকানো গোছের—রসিকতা যে দেশে থাকে সে দেশ দিয়েই বোধ হয় হাঁটেনি কখনও। রসিকতার চেষ্টা করলেই পিসীমা বলতেন, 'চুপ কর্ চুপ কর্—কথা ত নয়, যেন মধুর কলসীতে জোড়া জোড়া লাথি পড়ছে।' অর্থাৎ কেষ্টদা ও রাণুবৌদি অন্তরে বাহিরে একেবারে বেমানান ছিলেন।

অবশ্য রাণু বৌদি এ সব দিকে খুব চাপা-ধরনের মানুষ

ছিলেন—তবু এক একদিন আমার কাছে না বলে পারতেন না। এক-একদিনের আশাভঙ্গের ইতিহাস বলতে বলতে তাঁর চোখ ছলছলিয়ে আস্‌ত, কোন কোন দিন জলও পড়ত দু-চার ফোঁটা। সব চেয়ে অসহ্য ছিল তাঁর কাছে ঐ বিড়িটা—রাগ করে বলতেন, 'কী করে খায় ভাই ঐ পোড়া জিনিস, মুখের এক হাতের মধ্যে তিষ্ঠোতে পারি না,—এমন দুর্গন্ধ !' অথচ কেষ্টদার রাত্রে কোন কারণে অল্পক্ষণের জন্য ঘুম ভেঙ্গে গেলেও একটা বিড়ি খেয়ে নেওয়া চাই।

আরও তাঁর কাল হয়েছিলুম বোধ হয় আমিই। তখন ত অত বুঝতুম না, কলেজ লাইব্রেরী থেকে কবিতার বই এনে দিতুম, উপন্যাস চেয়ে এনে দিতুম লাইব্রেরী থেকে। ওঁর রোমাণ্টিক মনটিকে আমার খুব ভাল লাগত, তাই তাকেই বিকশিত হতে দেবার সুযোগ খুঁজতুম সব দিক দিয়ে—। হয়ত তা না হলে একদিন তিনি তাঁর স্বামীর সঙ্গেই খাপ খাইয়ে নিতে পারতেন।

কে জানে।

এখন মনকে প্রবোধ দিই যে, সবই তাঁর অদৃষ্ট, নইলে এমন হবে কেন ?

ছ'মাস এখানে কাটাবার পর রাণু বৌদি বাড়ী গেলেন। তাঁর বাপ-মায়ের ঠিক সে অবস্থা ছিল না কিন্তু পিসীমাই এক রকম জোর করে পাঠালেন। রাণু বৌদি যে এখানে একটু একটু করে শুকিয়ে উঠ্‌ছিলেন এটা তিনিও লক্ষ্য করেছিলেন যদিও কারণটা ঠিক অনুমান করতে পারেননি। তিনি ভেবে-ছিলেন ছেলেমানুষ, বহু দিন বাপমায়ের কাছছাড়া, ভাই-

বোনদের ফেলে এসেছে—মন কেমন করছে বোধ হয়। যাক্‌---দুদিন ঘুরে আসুক।

ওখানে গিয়ে তিনি প্রথম যে চিঠি দিয়েছিলেন আমাকে, তা নিতান্তই মামুলি। হাতের লেখা কদর্য্য, অসংখ্য ভুলে ভর্ত্তি, অর্দ্ধেক শব্দ লেখা হয়েছে, অর্দ্ধেক হয়নি। তবু তারই মধ্যে একটু কবিত্ব করার চেষ্টা ছিল দেখে আমি তার একটা খুব ভাল জবাব দিলাম (অন্তত আমার তাই বিশ্বাস)। আমিও তখন তরুণ, কবিত্ব করার সখ আছে অথচ ক্ষেত্র নেই, এতদিন এমন কেউ বিদেশে ছিল না যাকে একটা ভাল করে চিঠি দিতে পারি---সুতরাং এই প্রথম সুযোগের ভাল রকমেই সদ্ব্যবহার করেছিলাম, বলা বাহুল্য।

তার ফল কিন্তু ভাল হ'ল না। অবশ্য ঠিক তারই ফল কিনা জানি না---এবার রাণু বৌদি আমার কলেজের ঠিকানায় এক দীর্ঘ চিঠি দিলেন--একেবারে প্রেমপত্র। বটতলার সাহিত্য ধরনের লেখা, উচ্ছ্বাসে ভর্ত্তি---অত্যন্ত কাঁচা পাড়াগেঁয়ে সেকেলে প্রেম নিবেদন। কিন্তু তবু তার মধ্যে একটা জিনিস বুঝতে দেরি হল না যে, এর প্রত্যেকটি কথা তাঁর বুকের রক্ত দিয়ে লেখা—অনেকদিনের নিরুদ্ধ অন্তরবেদনা আজ সমস্ত সঙ্কোচের বাঁধ ভেঙ্গে বেরিয়েছে।

আমি কিন্তু এ চিঠি পেয়ে সেদিন বিরক্ত হয়েছিলুম। হয় ত বা একটু ভয়ও পেয়েছিলুম। এ কী ঝামেলায় জড়ালুম, এই একটা আশঙ্কা মনে মনে এবং অত্যন্ত মধুর একটা সম্পর্কের কদর্য্য পরিণতির সম্ভাবনায় বিরক্তি—এই ছিল বোধ হয় তখনকার ঠিক মনোভাব। তা ছাড়া আমার তখন যা বয়স তাতে মাংসলোলুপতা খুব স্বাভাবিক নয়, অন্তত

আমাদের আমলে ছিল না—এমনি একটা মধুর আন্তরিকতা, বন্ধুত্বের সম্পর্ক, একটু বিশ্বাসের আদান-প্রদান, এইটিই ছিল বাঞ্ছনীয়। সৌন্দর্য্যবোধ এবং নিজের বক্তব্য শোনাবার একটা ভাল শ্রোতা পেয়েও খুশী ছিলুম মনে মনে, বরং বলা যায় তাতেই খুশী ছিলুম, এমন সময় এই বিপত্তি।

পরবর্ত্তী জীবনে বাংলাদেশের-পক্ষে-দুর্লভ-সৌন্দর্য্যের অধিকারিণী একটি কিশোরীর কাছ থেকে অমন প্রেমপত্র পেলে নিজেকে হয়ত ধন্য বলে মনে করতুম, কিন্তু কে জানে কেন সেদিন তা পারিনি !

প্রথমটা ভেবেছিলুম যে একটা কড়া জবাব দিয়ে ঠান্ডা করে দেব—কিন্তু তারপরে ভেবে দেখলুম যে মানুষটা অত্যন্ত বুদ্ধিমান, কঠিন ভাবে নীরব থাকলেই ধৃষ্টতার উপযুক্ত জবাব হবে, আমার মনোভাব তার বুঝতে বাকী থাকবে না। শুধু শুধু কঠিন কথা বলতে গিয়ে নিজেকেই খানিকটা আহত করা হবে হয়ত !

তাই করলাম। না রাম না গঙ্গা—কোন চিঠি নয়।

দিন-পনেরো পরে আবার একটা চিঠি এল। কলেজের ঠিকানাতেই এবং খামে, কিন্তু চিঠি মাত্র তিন ছত্র—'আমাকে ক্ষমা করো, হঠাৎ আবেগের বশে চিঠি লিখে ফেলে পর্য্যন্ত শান্তি নেই মনে। আমাকে অন্তত তুমি ঘেন্না ক'রো না—আমার আর কেউ নেই।'

কী জানি কী রকম একটা বিরূপ মনোভাব হয়েছিল, সে চিঠিরও জবাব দিলাম না।

এর দিন-কতক পরেই রাণু বৌদি ফিরে এলেন। আগে

হলে তিনি পৌঁছবার আগেই আমি পৌঁছে যেতাম—কিন্তু এবার গেলাম তিন দিন পরে। গিয়েও পিসীমার সামনেই দু-একটি কুশল প্রশ্ন করে পাঁচ মিনিটের মধ্যে উঠে পড়লাম। পিসীমা অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন, 'তোর কী হ'ল রে ?'

'ভীষণ লেখাপড়ার চাপ যে পিসীমা, দুদিন পরেই ত পরীক্ষা !'

'তা বটে।' পিসীমা বলে উঠলেন, 'ও কথাটা মনে ছিল না।'

কিন্তু আসল কথাটা যে বোঝবার সে ঠিক বুঝল, পাথরের মত স্তব্ধ হয়ে বসে রইল, মাটির দিকে চেয়ে।

এর তিন-চার দিন পরেই খবর পেলুম রাণুবৌদির জ্বর হয়েছে। হওয়াও বিচিত্র নয়, অসময়ে যা বর্ষা গেল তিনদিন, নিশ্চয়ই ঠিক ঝি ওদের কামাই করেছে—ভিজে ভিজে কাজ করতে হয়েছে বৌদিকেই। ঠাণ্ডা লেগে সর্দ্দিজ্বর, ও আপনিই ভাল হবে।

আরও তিন দিন পরে খবর পেলুম জ্বর ছাড়েনি—পিসীমা ডাক্তার আনিয়েছেন। সুতরাং উদ্বিগ্ন হবার কথা- পিসীমার হাতে সামান্য টাকাকড়ি ছিল বটে, নইলে শুধু কেষ্টদার আয়ে ওদের সংসার চলত না, তবু চট্ করে সর্দ্দিজ্বর হলেই ডাক্তার ডাকবার মত পর্য্যাপ্ত পয়সা নিশ্চয়ই ছিল না। ডাক্তার ডাকা হয় এসব সংসারে রোগ বাঁকা দাঁড়ালেই। একবার যাওয়া দরকার।

বিকেলে মা-ও বললেন, 'একবার খবর নিয়ে আয়রে, শুনছি আজ দুজন ডাক্তার এসেছিলেন, এরই মধ্যে কী এমন হ'ল ?'

গিয়ে দেখি রাণুবৌদি অজ্ঞান অচৈতন্য। পাড়ার ডাক্তারই

আর একজন ডাক্তার এনেছেন—তিনি ওবেলা জ্বরের ওপরই কুইনাইন ইনজেক্‌শান দিয়ে গেছেন, নাকি খারাপ টাইপের ম্যালেরিয়া।

আরও দুদিন পরপর গেলাম, রাণুবৌদি এর ভেতর একবারও চোখ খুললেন না, জ্ঞান হওয়াত দূরের কথা। আমি ভাল বুঝলুম না। মনটায় বড় কষ্ট হ'ল—মনে হ'ল হয়ত মনোকষ্টেই এই অসুখটা করেছে। স্কলারশিপের কিছু টাকা জমানো ছিল হাতে, তাই দিয়ে একদিন কাউকে কিছু না বলে এক বড় ডাক্তার এনে হাজির করলুম। আমার কেমন সন্দেহ হয়েছিল যে এ দুজন ডাক্তার চিকিৎসাটা ঠিক-মত করতে পারছেন না, বড় ডাক্তার এসে সেই সন্দেহই প্রকাশ করলেন। তখন ধরা পড়ল হয়েছে খারাপ টাইপের টাইফয়েড, চিকিৎসা চলছে ম্যালেরিয়ার, তার ফলে রোগ আরও বেঁকে দাঁড়িয়েছে।

এর পর তিন চারদিন ভাল করেই চিকিৎসা চলল। এমন কি কেষ্টদাও কিছু টাকা ধার করে আনলেন কোথা থেকে, কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'ল না। ডাক্তারবাবু বললেন, 'এমন অদ্ভুত ধরনের রুগী আমি এর আগে আর দেখিনি। নেচার খানিকটা লড়াই করে, তবে ওষুধে ফল হয়—কিন্তু এর নেচার কিছুই করছেনা। বাঁচবার একটা ইচ্ছা থাকে সকলকার প্রবল—এর কিছুমাত্র নেই সে ইচ্ছে। একে কী করে বাঁচাব ? এ যেন মরতেই চায়।'

শেষের দিন বিকারও ছিল না, শুধু ধুক্ ধুক্ করছিল বুকটা। তার আগের দিন বিকারের ঘোরে শুধু বার বার বলেছিলেন, 'আমি কী অতই খারাপ—যে তুমি কথা পর্য্যন্ত কইলে না ? আর তুমি, তুমি কি এতই ভাল !'

কেউ বুঝল না, কিন্তু আমি বুঝলুম। হায়রে, একবারও যদি জ্ঞান হ'ত !

রাণু বৌদি, আমি হয়ত তোমাকে বিনাদোষে শাস্তি দিয়েছিলুম কিন্তু তুমিও ত অবিচার কম করলে না আমার ওপর ! বিনাদোষে আমার মাথায় এতখানি অনুতাপের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে গেলে !

গল্পের এইখানেই শেষ হবার কথা ! কিন্তু তা হ'ল না। এবারের ব্যাপারটা আরও যেন জটিল হয়ে উঠল।

প্রথম প্রথম দুঃখ একটু হয়েছিল বৈকি !

কিন্তু অল্প বয়স, সারা জীবন সামনে পড়ে, এসব দুঃখ দীর্ঘস্থায়ী হবার কথা নয়। আশা ও আদর্শের বিরাট রূপ সামনে, আত্মবিশ্বাসের অন্ত নেই। তুচ্ছ রাণু বৌদি আর তাঁর অভিমান—তাঁর স্মৃতি পর্য্যন্ত কোথায় তলিয়ে গেল। শুধু তাঁর বিয়ের ছবি থেকে যে এনলার্জ-করা ছবিটা ঘরে টাঙ্গিয়েছিলুম প্রথম শোকের সময়, কখনও কখনও কোন 'কর্ম্ম-হীন দীর্ঘ অবকাশে' বা কাজের ফাঁকে ধুলো-পড়া অবহেলিত সেই ছবিখানার দিকে চোখ পড়লে রাণু বৌদির কথা মনে হ'ত। সেই এক মুহূর্ত্তই, তারপর কোথায় কি, আবার নিজের স্বপ্নে, নিজের সাধনায় ডুবে যেতুম।

এম-এ পড়ছি যখন, সিক্‌স্‌থ্‌ ইয়ারে এক বান্ধবীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বেড়ে উঠল হঠাৎ। আমি ভাল ছাত্র, সুতরাং আমার নোটও ভাল, সেই নোট নিতে এবং পড়াশুনো বুঝে নিতেও জয়ন্তী আমার বাড়ীতে আসতে শুরু করেছিল কিছুদিন ধরেই। সহপাঠিনী, তায় বইখাতা নিয়ে লেখাপড়ার কথাই

আলোচনা হয়, সুতরাং কোন পক্ষের অভিভাবকই এর মধ্যে আপত্তিকর কিছু খুঁজে পান নি। বিশেষত জয়ন্তী আমার মাকে মা বলত, তাঁর কাছ থেকে কেড়ে বিগড়ে আবদার করে নিজের মেয়ের মতই খাবার খেত, রান্নাঘরে আড্ডা দিত ঘণ্টার পর ঘণ্টা—তার আচরণে সংশয়ের অবকাশমাত্র ছিল না। ইদানীং পরীক্ষা এগিয়ে আসতে সে দুপুর বেলা বই-খাতা বগলে সোজা আমার তেতালার ঘরে চলে আসত বটে কিন্তু যাবার সময় নীচে একটু আড্ডা দিয়ে যেতে তার ভুল হত না। সবাই খুশী ছিলেন, স্নেহের চোখেই দেখতেন মেয়েটিকে—

এই ভাবে ঘনিষ্ঠতা বাড়তে বাড়তে পড়ার সঙ্গে গল্প, মনের কথা বলা ইত্যাদি চলত। বন্ধুত্বের সম্পর্ক থেকে আরও অন্তরঙ্গ সম্পর্কের দিকে এগিয়ে চলল মনোভাবটা। আমার যে সেদিকে খুব সতর্কতা ছিল এমনও বলা যায় না—কারণ মেয়েটিকে আমার ভালই লেগেছিল।

অন্তরের সেই কতকটা স্বেচ্ছাকৃত অসতর্কতার অবসরে এক দারুণ গ্রীষ্মের মধ্যাহ্নে হঠাৎ একদিন সংযম হারালুম আমরা দুজনেই—গরমের দিনে এইরকম ক্লেদ ও স্বেদের মতই বোধ হয় মানসিক অধঃপতনটা সহজ হয়ে ওঠে—জয়ন্তীকে একহাতে জড়িয়ে টেনে নিলুম একেবারে বুকের মধ্যে, সে-ও কোন বাধা দিলে না, বরং আবেশে তার দুই চোখ বুজে এল, গাল দুটিতে কে যেন আবীর ঢেলে দিলে। কিন্তু যেমন মাথা হেঁট করে তার মুখের কাছে মুখ এনেছি, হয়ত উদ্দেশ্য ছিল চুম্বনেরই, সহসা দেখলুম যে-মুখ আমার সামনে নিমীলিত নেত্রে আদরের প্রত্যাশায় বিকশিত সে মুখ জয়ন্তীর নয়—বহুদিন আগেকার দেখা আর একখানা মুখ—রাণুবৌদির !

পরিষ্কার এবং স্পষ্ট—আবেগ কম্পিত থরোথরো জয়ন্তীর ঠোঁট-দুটি কোথায় মিলিয়ে গেছে, তার জায়গায় রাণুবৌদির সেই অতি-পরিচিত পাৎলা লাল ঠোঁট দুটি বিদ্রূপের হাসিতে অপরূপ হয়ে উঠেছে।

চমকে ছেড়ে দিলুম জয়ন্তীকে। বোধ হয় সে পড়েই যেত। কোন মতে সামলে নিলে নিজেকে, ততক্ষণে কতকটা প্রকৃতিস্থও হয়েছে সে—হয়ত কিছু ক্ষুণ্ণও, বই-খাতা গুছিয়ে নিয়ে একটি কথাও না কয়ে গম্ভীর মুখে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তার কি হ'ল—রাগ, অভিমান, অপমানবোধ না লজ্জা, সঙ্কোচ—কিছুই জানি না কিন্তু তারপর থেকে সে আর আমি বাড়ী থাকতে আসেনি একদিনও। নানা ছুতোয় কৈফিয়তের দায় এড়িয়ে গেছে।

অথচ আমিও তাকে সোজাসুজি খুলে কিছু বলতে পারলুম না। বলবই বা কি, নিজেই বুঝতে পারলুম না ঘটনাটা কি হ'ল। দৃষ্টিবিভ্রম না মস্তিষ্ক-বিকৃতি আজও ঠিক করতে পারিনি।

এরপর আরও কিছুদিন কাটল। ইতিমধ্যে জয়ন্তীর বিরহও বিস্মৃতিতে পরিণত হ'তে বসেছে।

এম-এ এবং ল পাস করে সাবডেপুটির চাকরী নিয়ে গেছি মফস্বলের এক শহরে।

অবিবাহিত এবং সচ্চরিত্র এমন একটি পাল্টি ঘরের ছেলেকে (হয়ত সুশ্রীও) হাতের কাছে পেয়ে এস-ডি-ও বা মহকুমা-হাকিম সাহেব হঠাৎ তাঁর বাংলোতে ঘন ঘন নিমন্ত্রণ

করতে লাগলেন। তখনও বিয়ে করিনি, মায়ের অনুরোধ নানা অজুহাতে এড়িয়ে গেছি কিন্তু তাই বলে ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা করে ত' বসিনি। বিয়ে করব এটা মনে ঠিকই ছিল সুতরাং হাকিম সাহেবের মনোভাব বুঝেও সতর্ক হওয়ার কোন কারণ খুঁজে পেলুম না। বিশেষত ললিতা দেখতেও খুব খারাপ নয়, ইণ্টারমিডিয়েট পড়ছে, ভাল গান গাইতে পারে, বুদ্ধিমতী, চট্‌পটে মেয়ে। হাকিম সাহেবের স্ত্রী ইচ্ছা করেই আমাদের নিভৃত আলাপের অবকাশ দিতেন। আমি তা বুঝেও আপত্তি করতাম না। বিদেশে এমন একটি মেয়ের সাহচর্য্য ভালই—বিশেষত যেখানে কোন কুফলের সম্ভাবনা নেই। বিয়ে যখন করতেই হবে একদিন—তখন মন্দ কি ?

একদিন হাকিম সাহেবের গাড়ীই নিজে চালিয়ে নিয়ে গেছি নদীর ধারে, মাইল চারেক দূর শহর থেকে, সঙ্গে ললিতা। অপরাহ্নের রক্তমেঘে নদীতীরের নিজ্জর্ন তটভূমি অপূর্ব্ব হয়ে উঠেছে, সেখানে গেলে সহজ মানুষও মাথা ঠিক রাখতে পারে না। পারিপার্শ্বিকের সে স্বপ্নময় আবেশ লেগেছিল ললিতাকেও। আস্তে কথা বলতে শুরু করলে, দৃষ্টি তার মুগ্ধ হয়ে এল। অবশেষে এক সময় তাকে টেনে নিলাম খুব কাছে, তার তনুলতা এলিয়ে পড়ল আমার বুকে, তার মাথা ও কাঁধের ভার আমার হাতের উপর। তার লজ্জারক্ত ঈষৎ কম্পিত অধরে এবং অর্দ্ধনিমীলিত চোখের পল্লবে যৌবনের পরিপূর্ণ আবেগে প্রথম অক্ষয় প্রণয়চুম্বন এঁকে দিতে যাবো, এমন সময় আবারও ভূত দেখার মত চম্‌কে উঠলাম ! কোথায় ললিতা ? আমার চোখের সামনে, খুব কাছে রাণুবৌদির সেই বহুদিনের বিস্মৃত মুখখানা, চোখে তেমনি কৌতুকের হাসি, ওষ্ঠ-দুটি

তেমনি বিদ্রূপের ভঙ্গীতে বাঁকানো !

ললিতা পড়েই গেল নদীর ধারে। সে বুঝল না ব্যাপার কি, রাগে ও বিরক্তিতে তার মুখ অন্ধকার হয়ে উঠলো। তাড়াতাড়ি তাকে তুলতে গেলাম হাত ধরে, অস্ফুট কণ্ঠে বললাম, 'আমাকে মাপ করো ললিতা, হঠাৎ মাথাটা কেমন ঘুরে উঠল'...কিন্তু সে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে সোজা গিয়ে গাড়ীতে উঠে বসল। ফেরবার পথে নীরবেই ফিরলাম...কেউ কারুর সঙ্গে একটিও কথা কইতে পারলুম না।

বলা বাহুল্য ললিতাকে পাবার আশা আর রইল না। কিন্তু এবার আমার কেমন একটা ভয় হয়ে গেল। বিরক্তও হয়ে উঠলুম নিজের দুর্ব্বল স্নায়ুগুলোর ওপর। এ কী কান্ড ! এমনি করে জীবনের অমৃত-পাত্র বার বার ওষ্ঠের প্রান্ত পর্য্যন্ত পেঁাছে অকারণে ফিরে যাবে ? একটা ভাল রকম পরীক্ষা করতেই হবে ব্যাপারটাকে।

মনে মনে অস্থির হয়ে উঠলাম। কাজে মন বসে না, আহারে রুচি চলে গেল। দুশ্চিন্তায় ললাটে রেখা দেখা দিলে।

কিন্তু আর পরীক্ষা করার সুযোগ কোথায় ?

দিন কয়েক ভেবে ভেবে মরীয়া হয়ে উঠলাম। তিন দিনের ছুটি নিয়ে চলে এলাম কলকাতা, তারপর পূর্ব্ব পরিচিত এক অসচ্চরিত্র বন্ধুকে ধরে বন্দোবস্ত করলাম পতিতালয়ে যাবার ! স্থান, কাল এবং পাত্রী ঠিক হ'ল— অত্যন্ত কুণ্ঠা ও ভয়ের সঙ্গে এক সময় সেখানে উপস্থিত হলাম। খুবই ঘৃণা ছিল আমার এ ব্যাপারে, অথচ আমি

স্বেচ্ছায় সেখানে উপস্থিত হয়েছি, অদৃষ্টের পরিহাস ছাড়া আর কি বলব ? তবে দেখলাম বন্ধুবর আমার বেশ একটু রুচিজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছে—মেয়েটি ভালই। ঠিক সাধারণ উৎকট পতিতাদের মত নয়। কোন মতে সহ্য করা যায়।

কিন্তু এবারেও—কিছুক্ষণ আলাপের পর ঠিক ঘনিষ্ঠ হবার মুহূর্ত্তে আবারও ফুটে উঠল রাণুবৌদির মুখ। পরিষ্কার স্পষ্ট, প্রত্যক্ষ। সেই হাসি-ভরা দৃষ্টি, সেই বিদ্রূপ মাখানো ওষ্ঠের ভঙ্গী ! বোধ হয় একটু চীৎকার করেই, ছুটে বেরিয়ে এলাম সেখান থেকে, তারপর একটা ট্যাক্সী নিয়ে চলে গেলাম একেবারে গঙ্গার ধারে।

কোথায় যাবো তা জানি না, শুধু একটু খোলা হাওয়ায় বেড়াতে হবে, এই জানি।

এ কী হ'ল ?

এমনি করেই কি রাণুবৌদির অভিশাপ লাগল আমাকে ? চিরদিন এই ভাবে সে বোঝা বয়ে চলতে হবে ?

শিক্ষিত বলে গর্ব্ব করি, ভূতে বিশ্বাস নেই—অথচ, অথচ এ ব্যাপারটাকে বোঝাই কি করে, এর অর্থ কী, তা কেমন করে জানব ?

বহুরাত্রি পর্য্যন্ত গঙ্গার ধারে ঘুরে বেড়ালাম। মাথা দিয়ে যেন আগুন বেরোচ্ছে, কতবার জল দিলাম থাবড়ে, তবু মাথা ঠাণ্ডা হয় না।

জীবন কি তাহ'লে এমনি ব্যর্থ হয়েই যাবে, অতৃপ্ত এক নারীর অন্তরের অত্যুগ্র ক্ষুধা এমন করে জীবনের পরপার থেকেও আমাকে ঘিরে থাকবে? মুক্তি কি নেই কোথাও ?

রাণুবৌদি, কেমন করে তোমাকে মুক্তি দেব এবং আমিও পাবো বলে দাও আমাকে!

চির-জীবন যৌবনের ক্ষুধা নিয়ে আমাকেও এমনি নিঃসঙ্গ জীবন টেনে বেড়াতে হবে? আত্মহত্যা ছাড়া কি পথ নেই কোথাও?

এমনি কত প্রশ্ন মাথায় আসতে লাগল খাপ্‌ছাড়া ভাবে, পাগলের মত এলোমেলো কত চিন্তা। ক্ষোভে দুঃখে মাথা খুঁড়তে ইচ্ছা হ'ল কঠিন রাস্তার ওপর...

তারপর এক সময়ে, একেবারে ভোরবেলা, হঠাৎ একটা কল্পনা মাথায় এসে গেল।

ঠিক ঠিক! একবার শেষ চেষ্টা করে দেখি, রাণুবৌদিকে তৃপ্ত করতে পারি কিনা।

উস্‌কো খুস্‌কো চুল, আরক্ত চক্ষু—মাতাল এবং লম্পট মনে করে ট্যাক্সিওয়ালা ডবল ভাড়া চাইলে, তবু তাইতেই রাজী হয়ে ফিরে এলুম বাড়ীতে। তেতলায় আমার ঘর এখনও খালিই থাকে, চাকরের কাছে চাবী চেয়ে নিয়ে খুলতে বেশী দেরী হ'ল না। দেওয়ালের ওপর থেকে রাণুবৌদির ছবিটা টেনে নিয়ে গিয়ে আবার ট্যাক্সি চড়লুম, 'চলো গঙ্গার ধারে, যত জোরে হয়।'

তখনও ভাল করে ফর্সা হয়নি, স্নানার্থীদের ভীড় জমেনি ঘাটে। তবু একপাশ ক'রে গিয়ে বসলুম জলের ধারে, মনে মনে রাণুবৌদিকে স্মরণ করবার চেষ্টা করলুম, বললুম, 'তুমি যেখানেই থাকো, তোমার অতৃপ্ত আত্মা ভগবানের চরণে যেন এবার শান্তি পায়।' তারপর ও'র সেই ছবিটা মুখের কাছে তুলে ধরে তার অধরের ওপর একটি গাঢ় চুম্বন এঁকে দিলুম।

কিন্তু আশ্চর্য্য এই, ছবির শীতল স্পর্শে মৃতদেহের ওষ্ঠ স্পর্শ করার মতই অনুভূতি হবার কথা—অথচ তা হ'ল না, যেন মনে হ'ল জীবিত কোন কিশোরীর উষ্ণ চুম্বনের তাপ লাগল আমায় ঠোঁটে, গালে কার গরম নিশ্বাসের ছোঁয়া।...

অকস্মাৎ একটা বাতাসের শব্দ হ'ল। এক ঝলক দক্ষিণা বাতাস যেন গঙ্গার বুকের ওপর থেকে উঠে ঘুরতে ঘুরতে এগিয়ে এল, মনে হ'ল যে নিঃশ্বাস অনুভব করেছি কিছু আগে, সেই নিঃশ্বাসের উষ্ণতাই আমাকে চারিদিক থেকে ঘিরে আচ্ছন্ন করে ফেললে, তারপর চতুর্দ্দিকে একটা সুগভীর প্রচণ্ড দীর্ঘনিঃশ্বাসের শব্দই জাগিয়ে বাতাসটা আবার যেন চলে গেল বহু দূরে, বোধ হয় উত্তরের দিকে, কোন্ অজানা দেশের উদ্দেশে...

আমিও একটা ছোট নিঃশ্বাস ফেলে ছবিখানা ধীরে ধীরে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিলাম।

শান্তি দাও, শান্তি দাও ভগবান, ওকে শান্তি দাও।...

তারপর থেকে আর রাণুবৌদি কোন দিন দেখা দেননি।

অতীতের তীর

কথাটা এতদিন যে কাউকে বলিনি তার কারণ আমি নিজেই ওটা ঠিক বিশ্বাস করতে পারিনি। এখনও করি না। কী যে ঘটেছিল তাও জানি না, হলপ করে বলতে পারব না। আমি যে ভাবে ঘটনাটাকে চোখে দেখেছি, ওর ইতিহাসের সঙ্গে আমি যতটুকু জড়িত, সেইটুকুই শুধু বলতে পারি কিন্তু তাতে লাভ কি ? আপনাদের ওষ্ঠপ্রান্তে যেটুকু পরিহাসের হাসি ফুটে উঠবে তা ত আমি এখান থেকেই দেখতে পাচ্ছি, আর তার জন্য দোষও দিই না বিশেষ। কারণ আমাকে এমন গল্প বলতে এলে আমিও ঠিক অমনি করেই অবিশ্বাস ও পরিহাসের হাসি হাসতুম।

তবু আজ যে বলতে বসেছি তার কারণ এই যে, কথাটা কাউকে না বলে আর থাকতে পারছি না। দীর্ঘ তিন বছর হয়ে গেল রহস্যটা মনের মধ্যেই চেপে রেখেছি ; মানুষের পক্ষে সম্ভব এত দীর্ঘ দিন এমন একটা চমকপ্রদ ইতিহাস একা একা অন্তরে বহন করা ? তা'ছাড়া, আমি যা জানি না, আমি যা বিশ্বাস করি না, তাই যে সব উড়িয়ে দিতে হবে তারই বা মানে কি ? আমি যে অর্থ খুঁজে পাইনি, যে রহস্য উদ্‌ঘাটিত করা সম্ভব হয়নি তা যে আপনাদের দ্বারা হবে না, তা কে বললে ?

আমাদের সন্তু মাষ্টারকে কে না চেনে ! অবশ্য আমাদের এই পাড়া বা গ্রামের কথাই বলছি। তবে হ্যাঁ, কলকাতায়ও বহুলোক চিনত বৈ কি !

হালদারের ছেলে সন্তু, রোগা লিক্‌লিকে, শ্যামবর্ণ, মাথায় ঘন চুল ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া, চোখে সর্ব্বদা একটা উৎসাহের দীপ্তি এবং মুখে একটা সবিনীত সলজ্জ হাসি। বাবার অবস্থা ওর মন্দ ছিল না, কী একটা মার্চ্চেণ্ট অফিসে ভাল চাকরী করতেন, চাইকি সন্তু লেখাপড়া শিখুক আর না শিখুক, ওকেও সে অফিসে ঢুকিয়ে দিয়ে যেতে পারতেন। আর আজ তাহ'লে সন্তুর দেড়শ দুশ টাকা মাইনে হয়ে যেত।

কিন্তু সন্তু সে ধার দিয়েই গেল না। লেড়াপড়া ত শিখলেই না, ক্লাস নাইনে বার দুই ফেল করে একেবারে ও পাঠ চুকিয়ে দিলে—চাকরীতে ঢুকতেও রাজী হ'ল না। মাথায় ঢুকল ও গান গাইবে। গান রীতিমত শেখেনি, বাড়ীতে হারমোনিয়াম পর্য্যন্ত ছিল না—তবু শুনে শুনে ও গান শিখতে লাগল এবং যেখানে সেখানে গায়ে পড়ে গান শোনাতে শুরু করলে। তখনও আমরা কেউ ওটা নিয়ে মাথা ঘামাইনি, ছেলেমানুষ পাগ্‌লামী করে বেড়াচ্ছে, বেড়াক্। কিন্তু যত দিন যেতে লাগল ততই ঝোঁকটা যেন বেড়ে চলল। কাজের মধ্যে পাড়ার যত রাজ্যের ছেলেমেয়ে জড়ো ক'রে স্বদেশী গানের তালিম দিতে থাকে, আর কোন একটা ছুতো পেলেই, তা কে জানে স্বাধীনতা দিবস আর কে জানে মে দিবস—দলবল নিয়ে প্রভাত ফেরীতে বেরিয়ে পড়ে। এ ছাড়া আর একটা কাজ ছিল, রেডিওতে ভাল গান থাকলেই চৌধুরী মশাইয়ের চায়ের দোকানে গিয়ে শোনা, নয়ত দত্তদের গ্রামো-ফোনের দোকানের সাম্‌নে হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকা।

সবচেয়ে বেচারীর কষ্ট হ'ত একটা হারমোনিয়মের জন্যে। ধীরেনের বাড়ী গিয়ে তার খোসামুদি করে হারমোনিয়মের

পর্দ্দা-গুলো চিনে নিয়েছিল কিন্তু সেও যন্ত্রে হাত দিতে দিত না। না বাজালে শিখ্‌বে কি ক'রে অথচ কে-ইবা ভরসা করে ওর মত আনাড়িকে ঘাঁট্‌তে দেবে যন্ত্র ?

শেষ পর্য্যন্ত পাড়ার কেষ্ট জ্যাঠামশাইকে ধরলে ও চেপে, 'আপনি যদি বাবাকে বলে দেন, চল্লিশটা টাকা হ'লেই ভাল সেকেন্ডহ্যান্ড হবে !'

জ্যাঠামশাই ভালমানুষ লোক, সরল বিশ্বাসে বলতে গেলেন, 'আহা, ছেলেমানুষ ঝোঁক্ হয়েছে, দাওনা বাপু কিনে একটা। গান বাজনা করেও ত আজকাল অনেকে টাকা রোজ-গার করছে ! ক্ষতি কি।'

কিন্তু সন্তুর বাবা যেন ক্ষেপে উঠলেন একেবারে, 'ক্ষতি নেই, বলছেন কি ? গানবাজনা করে কারা ? হাড়বকাটে হতভাগা ছেলেরা। আমি বাপ হয়ে ওকে ঐ সব কিনে দেব ? কোন দিন বলে বসবে বাবা টাকা দাও একটা মেয়েমানুষ রাখব। আপনি এসব কিছু বোঝেন না, কথা কইতে আসেন কেন ? হারমোনিয়াম কিনবে, বলুন আগে নিজের ভাতের ব্যবস্থা করে তবে ওসব করতে। আমার বাড়ী থেকে গানবাজনা করা চলবে না !'

অগত্যা সে আশা ছাড়তে হ'ল। মোদ্দা সন্তু হাল ছাড়লে না। শুনেছিল কলকাতায় হ্যারিসন রোডের উপর এক বড় ওস্তাদ থাকেন, তিনি গান শেখান। ও অতি কষ্টে মাকে বলে দুটাকা দিয়ে একটা মান্থলি টিকিট কিনে রোজ কলকাতা যেতে শুরু করলে। ওস্তাদের বাড়ীর নীচে এক খালি রক আছে, সেইখানে বসে থাক্‌ত আর কান পেতে শুন্‌ত ওস্তাদ কি শেখাচ্ছে। তবে তাতেও মুস্কিল হল, গলাটা সাধে

কোথায় ? শেষে স্থির করলে নস্করদের ঝিলের ধারে গিয়ে ভোর বেলা সাধবে। না হারমোনিয়ম না তানপুরা, বেসুরো হচ্ছে কিনা ঠিক করবার উপায় নেই, শুধু বসে হাঁ-হাঁ করে চীৎকার করে। ঝিলের ধারে বিশেষ লোকজন ছিল না তাই রক্ষা, নইলে বোধহয় ওকে পাগল ভেবে তাড়া করত।

এইভাবে বছরখানেক চীৎকার করার পর একটা কথা ওর মাথায় গেল। টিউশ্যনি করলে কি হয়? কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে এই যে, যারা গান শিখবে তারা ওর মত কালোয়াতী শিখ্‌তে চায় না—দুচারখানা চল্‌তি ফ্যাশানেব্‌ল্‌ গান শিখতে পারলেই খুশী। সেদিকে সন্তুর ভাঁড়ার একেবারেই খালি। তা'ছাড়া হারমোনিয়মটা চাই-ই, নইলে শেখাবে কি করে? আগে নিজেকে গান তুলে নিতে হবে ত! ওর মা-বাবা দুজনেই বিষম কড়া, ত'ছাড়া বাবা পয়সা-কড়ি কখনই মার হাতে দেন না যে, সেখান থেকে কিছু আদায় করবে!

হতাশায় ক্ষোভে ও প্রায় পাগল হ'তে বসেছে এমন সময় আমিই একটা সুযোগ করে দিলাম। আমাদের থিয়েটার ক্লাবে একটা হারমোনিয়ম কেনা হ'ল। আমি ক্লাবের সেক্রেটারী হিসাবে ওকে অনুমতি দিলাম দুপুর বেলা ক্লাবঘরে এসে হারমোনিয়াম শিখবার। অবিশ্যি তার বদলে তাকে দিয়ে কিছু কাজ করিয়ে নেবারও ব্যবস্থা করলাম বৈ কি! প্রতিদিন সন্ধ্যায় ও ক্লাব খুলে বসবে যতক্ষণ না কর্তাস্থানীয় কেউ যান এবং যাবতীয় পার্ট ও প্রম্‌প্‌ট্‌ করবার সাঁটগুলো কপি করবে। হাতের লেখাটি ওর ভালই ছিল।

এইবার জয়যাত্রা শুরু হয়ে গেল সন্তু মাষ্টারের দিকে দিকে। গলা ওর খুব ভালো ছিল না কিন্তু সুরজ্ঞান কিছু

ছিল সত্যিই। রেডিও এবং অসংখ্য গ্রামোফোনের দোকানের কল্যাণে চলতি রেকর্ডের গান তোলা কিছুমাত্র কঠিন নয়। তা'ছাড়া তার সুর ঠিক নিখুঁত হ'ল কিনা তা নিয়ে মাথা ঘামাবেই বা কে? মেয়ের বাবাদের লক্ষ্য কোনমতে বিয়ের বাজারে চলে গেলেই হ'ল। আর আজকাল যে আধুনিক কাব্য-সঙ্গীত হয়েছে তার মধ্যে সঙ্গীতাংশ ত বিশেষ কিছু নেই, কোনমতে নাকিসুরে খানিক কেঁদে গেলেই হ'ল। সুতরাং সন্তুর টিউশ্যনীর অভাব হ'ল না। সস্তায় যাঁরা মেয়েকে বিয়ের বাজারে চলনসই করতে চান তাঁরা সকলেই ওকে লুফে নিলেন। টাকার অত খাঁই ছিল না সন্তুর—বেশী চাইবার সাহসই ছিল না। ওর কাছে গান শিখে কেউ আবার সেজন্য টাকা দেবে এটা ভাবতেই যেন কেমন বিস্ময় লাগে ওর। সুতরাং পাঁচ টাকা আট টাকা যে-যা দিত তাই নিত ও। কোনটা সকালে, কোনটা রাত্রে, কোনটা দুপুরে। সপ্তাহে তিন দিন বা চারদিন—কাজেই সবকটা জড়িয়ে শিগ্‌গিরই ওর প্রায় মাসিক ত্রিশ টাকা আয় হয়ে গেল। অর্থাৎ নিজস্ব একটা হারমোনিয়মের স্বপ্নও আর ওর কাছে দুরাশা রইল না।

কিন্তু সবচেয়ে ওর বিজয়গৌরবের দিন হ'ল সেইদিন, যেদিন ওর বাবার বড়বাবু বাবাকে ডেকে বললেন, হ্যাঁহে সুবোধ, তোমার ছেলেটি নাকি খুব যত্ন ক'রে গান শেখায় শুনলুম! আমাকে শরৎ বলছিল যে, অন্য মাষ্টারদের মত ফাঁকি দিতে চায় না খুব খাটে। তা একবার জিজ্ঞাসা ক'রো না আমার ছোট মেয়েটাকে শেখাতে পারবে কি না?

সুবোধবাবু ত অবাক! বড়বাবুকে সন্তুষ্ট করবার এমন

একটা সুযোগ ঐ হতভাগা ছেলেটিকে দিয়ে পাওয়া যাবে তা তিনি আশাও করেন নি কখনও। তিনি মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললেন, 'স্যার তা ছেলেটা খাটে খুব। ফাঁকি স্যার আমরা কখনও দিতে শিখিনি। আমার কাছেই ত ওর শিক্ষা।'

'তা একবার জিজ্ঞাসা করো।'

'ওর আর জিজ্ঞাসা করাকরি কি স্যার! আপনি যখন বলছেন—'

'না, মানে সময় হবে কি না!'

'সময় করে নেবে। না হয় অন্য টিউশ্যনী ছেড়ে দেবে।'

এইবার সুবোধবাবুর কাছে ছেলের কিছু দাম হ'ল। বড়বাবুও বলা চলে, ছোট সাহেবও। এহেন মনিব যদি ছেলের সুখ্যাতি করেন তাহলে আর বখাটে বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে কি করে?

তবু বাড়ী এসে গাম্ভীর্য্য বজায় রেখেই ছেলের কাছে কথাটা পাড়তে হয়, 'তুমি ত আমার কোন কথাই শোন না কিন্তু আমার একটা কর্তব্য আছে ত। যতদিন আছি ততদিন না হয় ভাতের ভাবনা নেই, তারপর ত অগাধ জলে? যাক্ গে, বড়বাবুকে বলে কয়ে মত করিয়েছি ও'র মেয়েকে গান শেখাবার জন্য, তোমাকে রাখতে রাজী হয়েছেন। ভাল করে খেটে মোটামুটি খুশী করতে পারো ত আখেরে ভাবনা থাকবে না। কাল সকালেই ও'র সঙ্গে দেখা করো—সময় সুবিধা ঠিক্ করে এসো!'

সন্তু ত অবাক!

এতবড় সুখের দিন ওর বহুকাল আসেনি। বাবা ওকে

ডেকে গান শেখানোর কথা কয়েছেন ! ওর প্রতিভাকে স্বীকার করেছেন ! আবার একটা টিউশ্যনীও ঠিক করে এসেছেন ! ওর অধ্যবসায়ের ফল তাহলে মিলল। এখন তাহলে ঘরেই গলা সাধা চলবে।

পরের দিন থেকেই সে বড়বাবুর বাড়ী বাহাল হয়ে গেল। বালিগঞ্জে তাঁর বাড়ী—ওদের বাড়ী থেকে খুব বেশী দূরে নয়। আধুনিক হালফ্যাসানের কেতাদুরস্ত ঘরদোর—ছেলেমেয়েরাও তেমনি। এ রকম কোন জায়গায় যে কোন দিন ওর মত মাষ্টারের ডাক পড়বে সন্তু তা আশা করেনি। ও যেন কৃতার্থ হয়ে গেল। সুবোধবাবুর মেয়ে মিলি ওর কাছে গান শিখে যেন ওকেই ধন্য করবে...এই রকম সন্তুর মনোভাব কতকটা।

অবশ্য মিলি বেশ ঠাণ্ডা মেয়ে, গান বাজনার কিছু জানে না, জানবার চেষ্টাও নেই। আরও অনেক বাঙালী মেয়ের মতই সে বাপ মায়ের ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। সুবোধবাবুও তা জানতেন, সেই জন্যই বেশী পয়সা খরচ করে ভাল মাষ্টার রাখার চেষ্টা করেননি, সস্তার কথাটাই শুধু চিন্তা করেছেন। কিন্তু গোল বাধল অপর জায়গায়।

মিলিদের বাড়ীতে আর একটি মেয়ে ছিল, মিলিরই পিস্‌তুতো বোন, নাম সুমিত্রা। বাপ-মরা মেয়ে মামার বাড়ীতে আদরে মানুষ হয়েছে। আদর এইজন্য যে, ওর বিধবা মায়ের হাতে যথেষ্ট পয়সা ছিল, সুমিত্রাও একমাত্র মেয়ে, আদর দেবার কোন অসুবিধা নেই।

ছিপছিপে মেয়ে সুমিত্রা। খুবই রোগা, যেমন আজকালকার অধিকাংশ ইস্কুল কলেজের মেয়ে হয়, মানে বাংলা দেশে, তেমনি। স্বাস্থ্যের চিহ্ন কোথাও নেই, কম খায় এবং

কুপথ্য খায়। রংটা খুবই ফরসা তাতেই পাৎলা চামড়ার মধ্য দিয়ে নীল শিরা গোনা যায়—অস্বাস্থ্যের একটা ফ্যাকাশে ভাব মুখে। ডাগর চোখে রীমলেস চশমা, সৌখীন বাহারী সাড়ী দিনে-রাতে বহুবার বদল হয়। কথা কয় সিনেমার সুরে, বাংলা দেশের ছবিতে ও রেডিওতে অভিনেত্রীরা যেমন একটা বিশেষ সুরে কথা বলে তারই নকল ওটা। সর্ব্বদাই একটা ক্লান্ত ভাব, এটাও নাকি আভিজাত্যের লক্ষণ। এহেন মেয়েকে দেখে যদি সন্তু একটু সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে ত—বিশেষ দোষ দেওয়া যায় কি ?

আরও বিপদ হচ্ছে এই যে, মিলিকে গান শেখাবার সময় সুমিত্রা প্রায়ই এসে বসত। প্রথম দিনই প্রশ্ন করেছিল, 'মাষ্টার মশাই, আপনি রেডিওতে গান দেন না !'

অপ্রতিভ সন্তু মাথা চুলকে জবাব দিয়েছিল, 'না।'

'কেন ?' তারপর একটুখানি থেমে উত্তরের অপেক্ষা করে আবার বললে, 'আজকাল ত সবাই রেডিওতে গান দেয়। আমি যার কাছে শিখেছিলুম তিনি প্রায়ই গান রেডিওতে, যে কোন রকমের চলনসই গাইয়েই ত রেডিওতে গায়। আমিও শিগ্গিরই গাইব।

'আ—আপনি কার কাছে শিখেছিলেন গান ?' ভয়ে ভয়ে সসঙ্কোচে প্রশ্ন করে সন্তু, না ক'রে পারে না।

'আমি ?...সুরেশ দত্তের নাম শোনেননি ? বিখ্যাত গাইয়ে হিরণ্ময় দত্তের ভাই ? উনি অবশ্য রবীন্দ্রনাথের গানই গেয়ে থাকেন। আজকাল আবার রবীন্দ্রনাথের গান গাওয়াটাই ফ্যাশান হয়েছে কি না !...এসব কাব্য-সঙ্গীত আর চলে না।'

এমনি করে সুমিত্রা ওকে গুঁড়ো করে দেয়, চুরমার করে

দেয় ওর অভিমান। ওর সৌখীনতা ও উন্নাসিকতা এত সহজ সুমিত্রার পক্ষে, যে, সন্তু ওর দোষ দিতে পারে না, নিজেরই মাথা হেঁট হয়ে আসে, মাটির সঙ্গে মিশিয়ে যেতে চায়। যেন কতকটা সে নিজের প্রাপ্য ব'লে মেনে নেয়। সুমিত্রাকে কেউ মিলির অভিভাবকত্ব করতে বলেনি, সন্তুর পরীক্ষা নেবারও কথা নয়—এমন কি ওর সেখানে উপস্থিত থাকারও প্রয়োজন নেই—তবু হাতে অপর কোন কাজ না থাকায় সুমিত্রা প্রায়ই ওখানে এসে বসে এবং নানাভাবে সন্তুর অকিঞ্চিৎকরতা প্রমাণ করতে চেষ্টা করে। ওর ফরমাশে দু চারটে চলতি রবীন্দ্রনাথের গান শিখে এসে শেখাবার চেষ্টা করে সন্তু কিন্তু সুমিত্রা তাতেও নাক তোলে, 'এ মা, ও গান ত আজকাল সবাই জানে, এ বুঝি কেউ শেখে ! আপনি ঐটে জানেন না, অমুক গানটা ? ওটা শেখান না ?'

এমন গানের লাইন বলে যা সন্তু ত শোনেইনি, রবীন্দ্রনাথ বেঁচে থাকলেও মনে করতে পারতেন কি না সন্দেহ।

কিংবা বলে বসে, 'ওটা ত ঠিক সুর হচ্ছে না মাষ্টার মশাই। ভাল কার শিখে নেবেন। আপনি সুরেশ দার কাছে শেখেন না কেন ? খুব ভাল সুর জানেন সুরেশ দা। হিরণ্ময় বাবু শান্তিনিকেতন থেকে সুর আনান কি না !'

এগুলোই সবচেয়ে অপমানকর। অথচ প্রতিবাদ করতে পারে না, সন্তু প্রশ্ন করতে পারে না যে আসল সুরটা কী রকম হবে দেখিয়ে দিন—শুধু ছাত্রীর সামনে এই অপমানে ওর কানমুখ রাঙা হয়ে আসে।

অথচ সুমিত্রার গানও শুনেছে সন্তু। সেই মামুলী রেডিও ও রেকর্ডে চলতি গান। তাও সুর ঠিক হয় না।

কিন্তু সেটা সাহস করে মুখের ওপর বলে কে ? সুমিত্রার এমনই একটা সবজান্তা ভাব, এত ওপর থেকে সে সর্ব্বদা কথা বলে যে, তাকে প্রতিবাদ করার কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারে না সন্তু। বিশেষত গাইবার আগে সুমিত্রা যা তোড়জোড় এবং আদিখ্যেতা করে—এমন চিঁচিঁ গলায় গায় যে ওকে পাকা গাইয়ে বলে স্বীকার না করে উপায় নেই।

কিন্তু দুঃখের এইখানেই শেষ নয়—সন্তুর জীবনে গভীরতর দুঃখের কারণ হয়ে উঠ্‌ল সুমিত্রা।

কবিরা বলেন—আকাশের চাঁদ নাকি মাটির চন্দ্রমল্লিকাকে ভালবাসেন। এটা খুব অসম্ভব নয়, স্বীকার করি। কিন্তু কোন ব্যাঙ সাপকে ভালবেসেছে বলে আজ পর্যন্ত শুনিনি কিম্বা কোন বইতে এমন কথাও লেখা নেই যে জলের মাছ বকের প্রেমে পড়েছে।

ঠিক এমন কান্ডটা ঘটে গেল পৃথিবীতে। কবে কোন্ অসতর্ক মুহূর্ত্তে, নিজের অজ্ঞাতসারেই সন্তু ভালবেসে ফেললে সুমিত্রাকে। অথচ, সে ভাল করেই জানত যে, এটা ওর কাছে বামনের চন্দ্রলাভেচ্ছার চেয়েও দুরাশা। কিন্তু তার ভীরু মনে সুমিত্রারূপিণী চন্দ্রের আকর্ষণে যে জোয়ার উত্তাল হয়ে উঠেছে তার গতিবেগ রোধ করে এমন সাধ্য কার। সন্তুর সে ক্ষমতাও ছিল না, ইচ্ছাও ছিল না।

সুতরাং এ মনোভাবের অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ, সন্তু উঠে পড়ে লাগল যে, সে অন্ততঃ সুরেশ দত্তের যোগ্যতা অর্জ্জন করবে। সে রেডিওতে গেল 'অডিশান' দিতে—ওঁরা ওকে পছন্দ করলেন না। সে শুনেছিল যে ওখানে নাকি কিছু

ধরপাকড়ের ব্যাপার আছে, তা নইলে সত্যি সত্যিই সে এমন কিছু খারাপ গায় না, ওর মত গাইয়ে আরও দু-চারজন গেয়ে থাকে রোজই—কিন্তু ওর হয়ে ধর-পাকড় করবে কে ?

যাই হোক্—সন্তু হাল ছাড়লে না, ঐ একটা গুণ ছিল ওর, অধ্যবসায়ের অভাব ছিল না কোন দিন। রবীন্দ্রনাথের গান শেখায় এমন যে দুটি তিনটি ইস্কুল হয়েছে তাদের শিক্ষকদের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করলে। তাতে একটু বিলম্ব হবার সম্ভাবনা রইল বটে...কিন্তু উপায় কি ? সোজা-সুজি ইস্কুলে ভর্ত্তি হলে শিক্ষকরূপে যে সম্মান যায়। রেডিওতে রবিবার আধঘণ্টা গান শেখাবার ব্যবস্থা আছে। তা হ'লে কি হবে, বাড়ীতে ত রেডিও নেই, ছাত্রদের বাড়ী গিয়ে শিখতে পারে না, তারা কি মনে করবে ?

এধারে আর একটি কান্ড হয়ে গেল।

সুরেশদা যোগ্যতার আর একধাপ ওপরে উঠে গেলেন। তার একটি রেকর্ড বেরিয়ে গেল বাজারে। রেকর্ডের সেই প্রুফ কপিখানা এনে সুমিত্রা ওদের সামনে টেবিলে ফেলে ঠোঁট উলটে বললে, 'এখন গ্রামোফোন রেকর্ডের কী-ই বা মূল্য। যে-সেই ত রেকর্ড দিচ্ছে। একটু গাইতে জানলেই হ'ল। কী যে সুরেশদার সখ ! এতে করে উনি আরও ছোট আরও সাধারণ হয়ে গেলেন।'

সন্তুর শীর্ণ মুখের সমস্তটা ঘামে ভেসে যায়। এ এমন একটা আঘাত, যার বেদনা একা-একা নিঃশব্দে হজম করা ছাড়া উপায় থাকে না। অথচ সে জানে, মানে এতদিনে জেনেছে যে, এ জন্যে ওর লজ্জিত হওয়ার কোন কারণ নেই, সুমিত্রার মত মিলি ধনী নয়, সস্তায় হবে বলেই মিলির বাবা ওকে রেখেছেন।

তা'ছাড়া, সুরেশদার মত যোগ্যতা যদি সে অর্জ্জন করতে নাও পারে ত কোন ক্ষতি নেই। কারণ করলেই বা কি ? সুমিত্রা আই-এ পাশ ক'রে বি-এ পড়ছে, সে বড়লোকের মেয়ে, তার রূপ (?) আছে...তার পক্ষে সন্তুকে ভালবাসা বা বিয়ে করা একেবারেই অসম্ভব। কোন উন্মাদের কল্পনাতেও এমন কথা কোন দিন যাবে না। সুতরাং দরকার কি এ নিয়ে মাথা ঘামাবার। সুমিত্রার দৃষ্টিতে একটু শ্রদ্ধার আলো জ্বালাবার জন্য এ আপ্রাণ চেষ্টা কেন ওর ? লাভ কি ?

এ প্রশ্ন নিজেকেও করে দেখেছে ও, উত্তর পায়নি। অন্ধ, অবোধ দুর্নিবার একটা ইচ্ছা, অকারণ একটা লজ্জা ওকে ঠেলে দিয়েছে শুধু অন্তঃসারশূন্য একটা মেয়ের অন্তরে মূল্যহীন-শ্রদ্ধার আসন অধিকার করার চেষ্টায়।

এসব অবশ্য আমরা কেউ কিছু জানতুম না। পরে জানলুম, একটু একটু ক'রে, কিছু বা প্রশ্নের উত্তরে কিছু বা সম্ভব স্বেচ্ছাকৃত স্বীকারোক্তিতে।

অথচ সবার অজ্ঞাতে ধীরে ধীরে ছেলেটা নিজেকে ক্ষয় করছিল।

অসংখ্য টিউশ্যনী ধরেছিল পয়সার জন্য। কেশবিন্যাসটাও সুরেশদার মত হওয়া চাই ত! তাছাড়া ইদানীং বাবাও সংসারের জন্য কিছু টাকা দাবী করছিলেন। এর ওপর নিজের শিক্ষার অমানুষিক সাধনা চলছিল। শিখেও ফেলেছিল খুব। সত্যি কথা বলতে কি ইদানিং সে সুরেশের চেয়ে ঢের ভাল গাইত রবীন্দ্রনাথের গান কিন্তু তাতে কি ? সুমিত্রা ত আর গান বুঝে সুরেশের প্রশংসা করে না। সন্তু যদি

ভালবাসায় অন্ধ হয়ে না যেত, সুমিত্রা যদি তার উন্নাসিকতায় অমন করে ওর চোখ ধাঁধিয়ে না দিত, তাহলে এ প্রচেষ্টার অসারতা ওর নিজের কাছেই ধরা পড়ত একদিন। কিন্তু তা হ'ল না।

ইতিমধ্যে কঠোর পরিশ্রমে এবং আত্মঘাতী চিন্তায় ওর শরীর যে ভেঙ্গে এসেছিল তা কেউ বুঝতে পারে নি। সামান্য একটু সর্দি-জ্বর থেকে দাঁড়াল প্লুরিস্যাসি, সেও যদিবা সেরে উঠল ত শুরু হ'ল ঘুষঘুষে জ্বর। সে জ্বর আর গেল না। প্লুরিস্যাসির পর ঘুষঘুষে জ্বরের অর্থ কি তা সবাই জানত... আর ডাক্তারেও তাই বললেন, সাংঘাতিক দুটি অক্ষর সংক্ষেপে উচ্চারণ করে ওর আশা-আকাঙ্ক্ষা-প্রেম-অনুভূতি-স্বপ্ন-কল্পনার ওপর যেন কঠিন শীতল একটা আস্তরণ টেনে দিলেন... 'টি বি।'

ওর বাবার অবস্থা খুব খারাপ না হ'লেও কোন স্যানিটেরিয়ামে পাঠিয়ে রাজকীয় চিকিৎসা করাবার সঙ্গতি ছিল না। বাড়ীতেই টুক-টাক্ করে চিকিৎসা হ'তে লাগল। দামী ডাক্তারী ইন্‌জেক্‌শ্যানই বা কিনবে কে? তবু আমি উদ্যোগী হয়ে ওর সব ছাত্র-ছাত্রীদের বাড়ী থেকে কিছু কিছু চাঁদা তুললুম, বলাবাহুল্য তার মধ্যে সবচেয়ে কম টাকা দিলেন মিলির বাবা, কারণ তাঁর অবস্থাই ওদের মধ্যে সবচেয়ে ভাল। আমাদের ক্লাব থেকেও একটা চ্যারিটি শোর বন্দোবস্ত করা হ'ল। তাতে চারশ পঞ্চান্ন টাকা টিকিট বিক্রী হ'ল বটে কিন্তু দেখা গেল যে, চারশ টাকার ওপর খরচই হয়ে গেছে। বাকী টাকাটা মেম্বরদের কাছ থেকে চাঁদা তুলে এবং ক্লাব ফান্ড থেকে বাকীটা দিয়ে দেড়শ টাকা করে দেওয়া হ'ল। নইলে ক্লাবের প্রেষ্টিজ থাকে না।

এরই মধ্যে একদিন যেন ঈশ্বরের নিষ্ঠুর পরিহাসেই এক আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটল। এমন যোগাযোগ দৈবাৎ হয়! একই ডাকে সন্তুর নামে তিনখানা চিঠি এল। একখানা রেডিওর কন্‌ট্রাক্ট ফর্ম—আগামী মাসের শেষে একটা তারিখ দিয়ে ওর জন্য সময় নির্দ্দেশ করা হয়েছে—রবীন্দ্রসঙ্গীত; হিন্দুস্থান গ্রামোফোন কোম্পানী থেকে রেকর্ড তোলবার জন্য এক আমন্ত্রণ এবং সর্ব্বশেষ বিস্ময় ও সর্ব্বাপেক্ষা আঘাত, সুমিত্রার বিয়ের চিঠি। সুরেশ দত্তর সঙ্গে বিয়ে। এটা অবশ্য আমি কানাঘুষোয় আগেই শুনেছিলাম যে মা ও মামার অমতে নিজে জোর করে সুরেশ দত্তকে বিয়ে করছে সুমিত্রা। নিমন্ত্রণ পত্রেও দেখলাম, সুমিত্রা নিজে নিমন্ত্রণ করেছে। ওর বিবাহোৎসবে সন্তুকে যে স্মরণ করেছে এ া বিদ্রূপ না করুণা ঠিক বুঝলুম না ; কিংবাকঠিন নিষ্ঠুরতা !

চিঠিখানা পেয়ে সন্তুর রোগ-পাণ্ডুর বিবর্ণ মুখ বিবর্ণ-তর হয়ে উঠল, যে হাতে চিঠিখানা ধরা ছিল সে হাতখানা কাঁপছিল থর্ থর্ করে। কিন্তু মুখে সে কিছুই বললে না। অনেকক্ষণ পরে খামখানা হাতে নিয়ে শুধু প্রশ্ন করলে—'এটা ওর নিজের হাতে লেখা না ? এই ঠিকানাটা ?'

তারপর অবশ্য উত্তরের আশা না করেই খামে মুড়ে সযত্নে বালিশের তলায় রেখে দিয়ে ক্লান্তভাবে চোখ বুজল।

সন্ধ্যার সময় আবার যেতে একটুখানি ম্লান হেসে বললে, 'গ্রামোফোন কোম্পানীকে চিঠির জবাব দিয়ে দিলাম জগুদা, লিখে দিলাম যে এ কাঠামোতে আর ওদের কাছে রেকর্ড তোলানো সম্ভব হবে না।'

ভেবেছিলাম আমাকেই হয়ত এ চিঠিগুলোর জবাব লিখতে

হবে? যাক, ও তাহলে নিজেই লিখতে পেরেছে।

প্রশ্ন করলুম, 'অমনি রেডিওতে একটা লিখে দিয়েছ ত ?'

মুখখানা কেমন যেন সলজ্জ হয়ে গেল ওর, খানিকটা চুপ করে থেকে বললে, 'ওদের কন্‌ট্রাক্টটা সই করে পাঠিয়ে দিয়েছি!'

'ছি ছি! এ কী করলে!' ব্যস্ত হয়ে উঠি। তাড়াতাড়ি হাত দুটো চেপে ধরে বলে, 'কিছু বলবেন না জগুদা, এইটি শুধু মাপ করুন, লক্ষ্মীটি! আমায় বকবেন না। ও আমি যেমন করে হোক গিয়ে গেয়ে আসব। ওদের ঐ টাকা দিয়ে সুমিত্রাদের একটা বিয়ের প্রেজেণ্ট কিনে পাঠাব, এই আমার শেষ সখ।'

'তাতে যে তোমার শরীর বিষম খারাপ হয়ে পড়বে। এই বুক নিয়ে গাওয়া কি সহজ কথা। তুমি এমনিই প্রেজেণ্ট পাঠাও না, কী পাঠাবে?'

'না-না...ঐ টাকায়। অমনি কিছু পাঠাবো না। এমনি একটা শুভেচ্ছা জানিয়ে চিঠি একখানা লিখে দিয়েছি। মরতেই ত চলেছি, শরীর একদিন একটু বেশী খারাপ হ'লেই বা ক্ষতি কি?'

বুঝতেই ত পারছি যে ওর পক্ষে এ কন্‌ট্রাক্ট রাখা সম্ভব হবে না। মিছিমিছি ওর মনে ব্যথা দিয়ে লাভ নেই। অগত্যা চুপ করে গেলাম।

কিন্তু এর পর যেন ওর স্বাস্থ্যের দ্রুত অবনতি শুরু হ'ল। পরের মাসে এমন অবস্থা হ'ল যে শুধু কোনমতে জ্যামিতির বিন্দুর মত অস্তিত্বটুকু মাত্র রইল ওর, শয্যা থেকে আলাদা করে যে কিছু দেখাই যায় না।

ছেলেটাকে বড় ভালবেসে ফেলেছিলুম ইদানীং—মনটা খুবই খারাপ হয়ে গেল। একটু আধটু শেষ চেষ্টা যে না করলুম তা নয় কিন্তু কিছুই ফল হ'ল না। ক্রমে সবাই বুঝতে পারল যে আর বেশী দিন নয়। সুবোধবাবুও শেষ মুহূর্ত্তে ধার দেনা করে কিছু রাজকীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন কিন্তু তাতে ওঁর মানসিক সান্ত্বনা ছাড়া কোন লাভ হল না।

আমরা সবাই ওকে নিয়েই ব্যস্ত, ওর সে রেডিও কন্‌ট্রাক্টের কথা ভুলেই গিয়েছিলাম, ও কিন্তু ভোলেনি। সেদিন মঙ্গলবার সেটা মনে আছে; সকাল বেলাই ক্ষীণকণ্ঠে তারিখটা জানতে চাইলে। তারপর চোখ বুজে খানিকটা মনে মনে কী যেন হিসাব করে বললে 'আজই আমার গাইবার কথা। হ'ল না জগুদা। এ সখটাও মিট্‌ল না। একবার যদি কোন্ রকম করেও যেতে পারতাম, একখানা গানও—'

বেচারী! ওর আকুতি দেখে চোখে জল এসে গেল।

কিন্তু আজ যা অবস্থা ওর, হাতই নাড়তে পারছে না। মনে হচ্ছে মুখটা ঘোরাতেও কষ্ট হচ্ছে। সন্তুর নিজের বিশ্বাস এখনও কিছুদিন বাঁচবে অবশ্য, তবে আমরা বুঝতে পেরেছিলাম যে আজ-কালের মধ্যেই শ্বাস উঠ্‌বে।

সেদিন বিকেলে অফিস থেকে বেরোতে আমার একটু দেরী হয়ে গিয়েছিল। তাড়াতাড়ি ট্রামে এসে গড়িয়াহাটের মোড়ে নেমে বাসের জন্য অপেক্ষা করছি, হঠাৎ সামনের জুতোর দোকানের রেডিওটার দিকে কান গেল।

এ যেন পরিচিত নাম!

ঐ ত পরিষ্কার বললে, 'এবার আপনাদের একখানা

রবীন্দ্র-সঙ্গীত গেয়ে শোনাচ্ছেন সনৎকুমার হালদার—যাবার বেলায় পিছু ডাকে !'

আমি কি ভুল শুনছি ? খোয়াবী দেখছি জেগে জেগে ?

বাস্ এসে চলে গেল। আমার ওঠা হ'ল না।

আর—ঐ ত অতি পরিচিত সেই কণ্ঠ। বহুবার ওর গান শুনেছি, ভুল হবার নয়। কী করে গেল সে ? ঐ দেহ, রেডিও কর্ত্তৃপক্ষই বা কি বলে অনুমতি দিলেন !

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সমস্ত গানটি শুনলাম তারপর যখন চমক ভাঙ্গল দেখি আর কার গান হচ্ছে।

আর বাসের জন্য অপেক্ষা করলুম না। ঊর্দ্ধ্বশ্বাসে প্রায় দৌড় দিলুম সন্তুর বাড়ীর উদ্দেশে। মিনিট পনেরো পরে যখন ওদের বাড়ী পেঁছিলুম তখন বেশ অন্ধকার হয়ে এসেছে, ওর মা সবে সন্ধ্যা দিয়ে আলো নিয়ে এ ঘরে আসছেন। আমি তিরস্কারের সুরে বললুম, 'রুগীকে এখনও পর্য্যন্ত অন্ধকারে ফেলে রেখেছেন মাসীমা!'

'কী করি বাবা' দেরি হয়ে গেল। একা মানুষ ত ! তা ছাড়া ও আবার এক-একদিন আলো জ্বালতেই দেয় না !'

দুজনে একই সঙ্গে ঘরে ঢুকলুম।

নিথর হয়ে কাঠের মত পড়ে আছে সন্তু। কাছে যেতেই বুঝতে পারলুম ব্যাপারটা। সব শেষ হয়ে গেছে।

ওর মা আছড়ে পড়লেন চীৎকার করে। পাড়ার লোকজন ছুটে এল। তারপর সৎকারের ব্যবস্থা করবার সময় সরাতে গিয়ে বালিশের নীচে দুটি জিনিস পেলাম—একটি সেই সুমিত্রার বিয়ের চিঠি, আর একটি রেডিওর একখানা চেক্। সেই—তারিখের, মায় পিছনে সন্তুর সইসুদ্ধ !

চেকখানা সরিয়ে রেখেছিলাম। সেটা ভাঙ্গিয়ে কতগুলো বই কিনে পাঠিয়ে দিলাম সন্তুর নাম ক'রে সুমিত্রার কাছে—ওর যে শেষ ইচ্ছা ঐ ছিল, তাও জানিয়ে দিলাম।

কিন্তু আসল প্রশ্নটারই কোন মীমাংসা করতে পারিনি আজ পর্য্যন্ত। সন্তু গেল কী করে রেডিও ষ্টেশানে, আর ফিরেই বা এল কি ক'রে আমি আসবার আগে।

এর উত্তর আর জীবনে পাবও না কোনদিন।

শুনেছি একাগ্র কামনার পক্ষে সবই সম্ভব। কিন্তু এতটাও সম্ভব হয় কি ? কে জানে !

প্রেতের আলিঙ্গন

কলেজ স্কোয়ারের এক সরবতের দোকানে তিন বন্ধুতে অনেক দিনের পর দেখা।

শৈলেন কহিল, কিরে সুধাংশু, চেহারায় ভোল ফিরিয়ে ফেলেছিস্ যে !

সুধাংশু জবাব দিল, পশ্চিমের জল-হাওয়া ভাল, ঘি-দুধ সস্তা। যেমন খাই, তেমনিই মেহনত; তাকৎ হবে না কেন বল্ ?

সুধীর ফোড়ন কাটিয়া কহিল, পকেটেও দু-এক পয়সার আগমন হচ্ছে সেটা বল্—

সুধাংশু কহিল, সেটা আর পাপ মুখে কি ক'রে বলি বল। একে আজ মঙ্গলবার।

তারপর একটা কৃত্রিম দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিল, এম্‌নিই ত মা-লক্ষীর যা স্বভাব, আসার চেয়ে যাওয়ার দিকেই তাঁর ঝোঁক বেশী।

সরবৎ আসিয়া পেঁাছিয়াছিল, কাগজের পাইপে মুখ দিয়া কিছুক্ষণ সরবৎ টানার পর শৈলেশ কহিল, মাইরি সুধাংশু, একা ত ঢের ক'রেছিস্, এই গরমে এক বাটী ক'রে আইস্-ক্রীম খাইয়ে দে না, তোকে আশীর্ব্বাদ করতে করতে খাই—

সুধাংশু আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, এখনও আইস্‌ক্রীম খাস্ তোরা ? এঃ---নেহাৎ ছেলেমানুষ আছিস্।

শৈলেশ কহিল, তবে কি তোর বিশ্বাস, বুড়ো হ'য়ে গেছি ?

সুধাংশু কহিল, আইস্‌ক্রীম খেতুম যখন গোঁফ ওঠেনি

তখন, যখন অন্ধকারে দেশে যেতে গেলে ভূতের ভয় করত!

সুধীর ফুট্ করিয়া কহিল, তার মানে তুই বল্‌তে চাস্ আর ভূতের ভয় করে না---এই ত!

---ভূত!

সুধাংশু হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, তারপর নিজের বলিষ্ঠ দেহটার দিকে একবার চোখ বুলাইয়া এবং দৃঢ় মাংস-পেশীগুলি হাত দিয়া অনুভব করিয়া কহিল, এই দেহের কাছে ভূতের ভয় ঘেঁষে?

সুধীর কথা কহিল না, শুধু হাসিল।

—হাসলি যে?

সুধীর জবাব দিল, ভূতের ভয়টা জোয়ানদেরই বেশী। বরং চিম্‌ড়েদের কাছে ঘেঁষে না।

সুধাংশু অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া কহিল, ও আমি বিশ্বাস করি না। দেহে যাদের বল কম, মনের বলও তাদের কম।···এই ছোক্‌রা, এক কাপ ক'রে আইসক্রীম দিয়ে যাও—

শৈলেন কহিল, তোর বলিষ্ঠ দেহের জয় হোক, আমরা ভূতকে ভয় ক'রে আর আইসক্রীম খেয়েই যেন ইহকালটা কাটিয়ে যেতে পারি···

চামচ দুই আইসক্রীম মুখে পুরিয়া সহসা সুধীর কহিল, আচ্ছা বড়াই ত করছিস খুব, থাকতে পারিস একটা ভূতুড়ে বাড়ীতে একলা? সারারাত?···

সুধাংশু কহিল, আলবৎ পারি।

সুধীর কহিল, বাজী?

সুধাংশু কহিল, দেড় শ' টাকা···!

সুধীর কহিল, বেশ। দেড়শ' টাকাই ঠিক রইল। মানিক-

তলায় আমার এক মাসীর বাড়ী আছে, সেই বাড়ীতে আসছে শনিবার যদি সারারাত কাটাতে পার সকাল বেলা দেড়শ' টাকা গুণে দেব। আর যদি ভয় পাও, কিম্বা ছুটে বেরিয়ে যাও তা'হলে তুমি আমায় দেড়শ' টাকা দেবে।

সুধাংশু ইতিমধ্যে তাতিয়া গিয়াছিল, কহিল, আমি যদি থাকতে না পারি দুশো টাকা দেব।...কিন্তু আমায় একটা পিস্তল যোগাড় ক'রে দিতে হবে...আমারটা আমি এটোয়াতে রেখে এসেছি।

সুধীর কহিল, ঐ ত বাবা, ভাবনায় ফেললে! পিস্তল পাই কোথা? লাইসেন্স আমাদের নেই-ও, পুলিস দেবেও না!

শৈলেশ সে-সমস্যার সমাধান করিয়া দিল, কহিল, আচ্ছা সে ব্যবস্থা আমি করব। আমার সেজদা পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর, একরাত্রের জন্য তার পিস্তল আমি চেয়ে নিতে পারব—

সুধীর লাফাইয়া উঠিল। কহিল, ব্যস্ তাহলে আর কিছু বলবার নেই ত?

সুধাংশু মাথা নাড়িয়া কহিল, নাঃ কিছু না! সুধীর উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, তা হলে পাকা কথা রইল, শনিবার সন্ধ্যায় তুমি খেয়ে-দেয়ে আমার বাসায় যাবে।...কিন্তু আমি সাবধান করে দিচ্ছি এখনও, সেদিন আবার অমাবস্যা; যদি কিছু হয় আমাদের দায়ী কোর না।

—আচ্ছা।

* * * *

যেখানে গিয়া ট্যাক্সী থামিল, সেখান হইতে বাড়ীটা প্রায় মিনিট দশেকের রাস্তা। দু'ধারে নিবিড় বন, মধ্যে পায়ে হাঁটা

কাঁচা রাস্তা। সরকারী রাস্তার মোড়ে একটি গ্যাসের আলো ছিল, কিন্তু এখানে সে সবের বালাই নাই। মধ্যে মধ্যে এক একটা কেরোসিনের আলো জ্বলিতেছে; কিন্তু তাহাতে আলোর অপেক্ষা অন্ধকারই বেশী। সেই অন্ধকারের মধ্যে অশ্রান্ত ঝিঁ-ঝিঁ পোকার ডাকও যেন বিভীষিকার সৃষ্টি করে।

প্রায় দশ মিনিট চলিবার পর একটা ভাঙ্গা খোলার ঘর এবং তাহার পাশে একটা ভাঙ্গা দোতালা পাকা বাড়ী নজরে পড়িল। বাড়ীটি যে খুবই জরাজীর্ণ তাহা নহে, কিন্তু অব্যবহার্য্য হইয়া পড়িয়া থাকায় তাহা বাসের অযোগ্য হইয়া উঠিয়াছে। বাড়ীটির সম্মুখে এককালে বাগান ছিল কিন্তু তাহাও গভীর অরণ্যে পরিণত হইয়াছে।

দ্বারে একটা ভারী তালা লাগানো ছিল। সুধীর পকেট হইতে চাবী বাহির করিয়া তালাটা খুলিয়া ফেলিল, শৈলেশ টর্চ্চ জ্বালিয়া পথ দেখাইয়া দোতলায় উঠিল। সিঁড়ি যেখানে শেষ হইয়াছে সেটা দালান; দালানের শেষে যে ঘর সেই ঘরের দ্বার খুলিয়া ফেলিয়া সুধীর ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল, পিছনে শৈলেশ ও সুধাংশু।

সুধীর পকেট হইতে বাতি ও দেশলাই বাহির করিয়া একটা বাতি জ্বালিল তারপর বাতিটা টেবিলের উপর রাখিয়া কহিল, আজ সকালে এসে ঘরটা সাফ্ ক'রে এই সব ফার্নিচার এনে, ঠিক ক'রে রেখে গেছি। দেখে শুনে নাও সব—

বাতির ক্ষীণ আলোতে সুধাংশু দেখিল, একটা দড়ীর খাটিয়া, একখানা ক্যাম্প-চেয়ার ও ছোট একটা টেবিল ঘরে আনা হইয়াছে। খাটিয়াতে একটা সতরঞ্চী, একখানা ধোয়া চাদর ও একটা বালিশ দিয়া বিছানার মতও করা হইয়াছে।

ঘরের কোণে একটা ছোট কুঁজো ও কাঁচের গ্লাস পর্য্যন্ত রহিয়াছে।

সুধাংশু কহিল, বা-রে! এ যে রীতিমত সংসার সাজিয়ে ফেলেছিস দেখছি। না—আর কিছু চাই না, একটা রাত কাটাবার পক্ষে এই-ই যথেষ্ট।

শৈলেশ পকেট হইতে একটা ক্ষুদ্র ব্রাউনিং বাহির করিয়া টেবিলে রাখিয়া কহিল, ছ'ঘরা রিভলবার এটা—আর সে ত তুমি দেখেই বুঝতে পারবে; তোমার যখন আছেই—

সুধীর কহিল, বাতিটা জ্বলুক, কিন্তু দেশালাই পাবে না। যদি নিভে যায় তাহ'লে অন্ধকারে থাকতে হবে। তবে তোমার সময় কাটাবার জন্য একখানা বইও এনেছি, দিয়ে যেতে পারি।

সুধাংশু কহিল, খুব ভাল হয় মাইরি। তোরা যখন বল্‌লি আমি কিছুই সঙ্গে আনতে পাব না, তখন আর কোনও কথা মনে হয়নি, ঐ বইএর কথাই মনে হ'য়েছিল।

—এই রইল।

টেবিলের উপর বই রাখিয়া সুধীর ও শৈলেশ বাহির হইয়া গেল। দোর বন্ধ করার আগে সুধীর শুধু গলা বাহির করিয়া বলিয়া গেল, রাত চারটের সময় আসব ঠিক।...দেখ এখনও ভাল ক'রে ভেবে দেখ, এর আগে যে এখানে রাত কাটিয়েছিল পরের দিন সকাল বেলা তার মৃতদেহ শুধু পাওয়া গিয়েছিল—যেন কে গলা টিপে মেরে রেখে গেছে—

সুধাংশু তাড়া দিয়া কহিল, আচ্ছা, আচ্ছা, হয়েছে; যা—

দ্বার ভেজাইয়া দিয়া তাহারা চলিয়া গেল। সুধাংশু এবার ভাল করিয়া ঘরটার দিকে চাহিয়া দেখিল ঘরটির গঠন

অদ্ভুত। জানালা মাত্র একটি কিন্তু দ্বার দুইটি। একটি দিয়া এইমাত্র ইহারা বাহির হইয়া গেল। আর একটি যেন পাশের ঘরে গমনাগমনের উদ্দেশ্যে করা হইয়াছে বলিয়া মনে হইল। প্রথমোক্ত দ্বারটি ভিতর হইতে সুধাংশু ভাল করিয়া খিল আঁটিয়া বন্ধ করিল কিন্তু দ্বিতীয় দ্বারটির কাছে গিয়া দেখিল তাহার খিল নাই, ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, টানিয়া দেখিল খোলে না—বোধ হয় ওঘর হইতে বন্ধ। এতবড় ঘরে একটি মাত্র জানালা রাখার কোনও অর্থ বোঝা গেল না। সুধাংশুর অত্যন্ত রাগ ধরিল ভূতের উপর···বিশেষ করিয়া এই ঘরটিই কেন ? এই গরমে হয়ত অন্য ঘরে জানালার সংখ্যা বেশী ছিল,—

কিন্তু বাতির আলো একবার সহসা উজ্জ্বল হইয়া উঠিতে সুধাংশু দেখিল আরও একটি জানালা আছে কিন্তু কোনও কারণে সেটির পাল্লা দু'টি বন্ধ, অর্থাৎ স্ক্রু দিয়া আঁটা। কিছুক্ষণ চেষ্টা করিয়াও যখন খোলা গেল না, বরং সমস্ত শরীর স্বেদাক্ত হইয়া উঠিল, তখন সুধাংশু হাল ছাড়িয়া এধারের সেই অদ্বিতীয় জানালাটি ভাল করিয়া খুলিয়া দিল তারপর আসিয়া চেয়ারটায় বসিল।

জানালা একে সেই একটি মাত্র তাহাতে আবার কী একটা প্রকাণ্ড গাছের ডালে তাহার মুখ প্রায় আচ্ছন্ন। হাওয়া মোটেই নাই, অসহ্য গরমে সুধাংশু অস্থির হইয়া উঠিল। আপন মনেই কহিল, ভূত না হাতী, শুধু শুধু আমায় কষ্ট দেওয়া।

উঃ—কী গরম !

খানিকটা ইতস্ততঃ করিয়া বইটি টেবিল হইতে তুলিয়া লইল, সেটা একটা বিলাতী-গল্পের বই, নাড়া-চাড়া করিয়া

দেখিল তাহার সবগুলিই ভূতের গল্প। একবার রাখিয়া দিল, কিন্তু তখন তাহার ঘুমাইবার ইচ্ছাও ছিল না, ঘুম সে গরমে খুব সম্ভব হইবেও না। সুতরাং আবার সেই বইটাই তুলিয়া লইল। পাতা ওল্‌টাইতে ওল্‌টাইতে নজরে পড়িল একটা গল্পের পাশে লাল পেনসিলের দাগ রহিয়াছে, কৌতূহল বশতঃ সেইটিই পড়িতে আরম্ভ করিল।

গল্পটির আখ্যান ভাগ এইরূপ ঃ—

এক ভদ্রলোক তাঁহার দুই কন্যা লইয়া ময়দানের একটি বাড়ীতে নূতন ভাড়া আসিলেন। যেদিন উঠিয়া আসিলেন সেদিনই তাঁহাকে বিশেষ কাজে লণ্ডনে আসিতে হইল, ফলে কুমারী কন্যা দুইটি সেই নূতন জায়গায় সম্পূর্ণ অসহায় অবস্থায় রহিল। বড় মেয়েটির বয়সও বেশী, তাহার সাহসও ছোট মেয়েটির অপেক্ষা অনেক বেশী, সে-ই ছোট বোনকে ভরসা দিল এবং বাড়ীর সব দ্বার-জানালা বন্ধ করিয়া উপরের একটি ঘরে দুইবোনে একই বিছানায় শয়ন করিল। অল্প একটু তন্দ্রার মধ্যেই ছোট মেয়েটি স্বপ্ন দেখিল যেন কে তাহার দিদিকে গলা কাটিয়া মারিয়া ফেলিয়াছে এবং তাহাকেও অন্ধ-কারের মধ্যে যেন গলা টিপিয়া মারিতে আসিতেছে—

সে যেন অশরীরী দেহ।

দারুণ আতঙ্কে তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তাড়াতাড়ি পাশে হাত দিয়া দেখিল বড়বোন অগাধে নিদ্রা যাইতেছে। সেও তখন নিশ্চিন্ত হইয়া পুনরায় ঘুমাইবার উদ্যোগ করিল, ঠিক সেই সময়ে যেন মনে হইল নীচে কি একটা শব্দ হইল।

ছোট মেয়েটির গায়ে কাঁটা দিল···সে কান পাতিয়া ভাল করিয়া শুনিবার চেষ্টা করিল, আবার সেই রকম শব্দ কানে

আসিল, চাপা একটা অস্ফুট শব্দ, কে যেন খুব সন্তর্পণে চলা-ফেরা করিতেছে। এবারে সে দিদিকে জাগাইয়া শুষ্ক কণ্ঠে ভয়ের কারণ তাহার কাছে বিবৃত করিল। অতি সংক্ষেপে স্বপ্নের বিবরণও জানাইয়া দিল।

তাহার দিদি হাসিয়া উঠিল, কহিল, দূর পাগ্‌লী, ভূত না আরও কিছু। চোর-টোর হবে, দাঁড়া আমি ওকে জব্দ ক'রে দিচ্ছি।

ছোট বোন ভয় পাইয়া কহিল, তুমি যাবে নাকি নীচে ?

দিদি কহিল, যাব বৈকি।...দেখ্‌না এক মজা করছি। খালি পায়ে চুপি চুপি নীচে গিয়ে একেবারে হঠাৎ ওর সামনে হাজির হবো, অন্ধকারে এই সাদা চেহারা নিঃশব্দে সামনে হাজির হ'লে, বাছাধন ভয়েই অজ্ঞান হ'য়ে যাবে !

ছোট বোন কিন্তু ইহাতেও বিশেষ ভরসা পাইল না, বলিল, যেও না ; আমার বড্ড ভয় করবে।

দিদি তাহার গালটা টিপিয়া কহিল, যাব আর আসব, আচ্ছা বরং এক কাজ করছি, বাইরে থেকে চাবী দিয়ে যাচ্ছি তা'হলে ত আর তোর ভয় করবে না !

এই কথার পরই বড় বোন নিঃশব্দে খাট হইতে নামিয়া পড়িল। তারপর খালি পায়ে ঘরের বাহির হইয়া বাহির হইতে অত্যন্ত সন্তর্পণে কপাটে চাবী বন্ধ করিয়া দিল। তারপর আবার সব নিস্তব্ধ...

ছোট বোন বেচারী ভয়ে কাঠ হইয়া পড়িয়া রহিল এবং লেপের মধ্যে সেই দারুণ শীতেও ঘামিয়া উঠিল। প্রায় দুই তিন মিনিট পরেই কিন্তু নীচে হইতে বিশ্রী একটা শব্দ আসিল, কী যেন ভারী জিনিস পড়ার মত। যেন একটা

অস্ফুট আর্ত্তনাদও, তারপরই সব চুপচাপ !

তবে কি···

তাহার গলায় যেন কী একটা পুঁটলির মত ঠেলিয়া উঠিল। হাত পা অসাড় হইয়া আসিল, দিদি—দিদি—

ঐ না কাহার পায়ের শব্দ ? হাঁ, শব্দই ত। কে খালি পায়ে ধীরে ধীরে সিঁড়ি দিয়া উঠিতেছে। ঐ ত' তাহার বড় বোন ফিরিয়া আসিতেছে,—

তাহার বুক হইতে যেন পাষাণ নামিয়া গেল, এমন কি একটু হাসিও পাইল। অনর্থক সে ভয় পাইয়াছিল। চোরটা বোধ হয় তাহার দিদিকে দেখিয়া পলাইতে গিয়া চেয়ার-টেয়ার কিছু উলটাইয়া দিয়াছে—

পায়ের শব্দ কাছে আসিতে আসিতে একেবারে দোরের কাছে আসিয়া থামিল। ছোট বোন সাগ্রহে কহিল, দিদি এলে ?

কোন উত্তর নাই।

কিন্তু কপাটের গায়ে কে হাত দিল, তালায় চাবীও লাগাইল। তারপর দ্বারটি খুলিয়া অন্ধকারেই কে ঘরে ঢুকিল।

—দিদি !

কোনও জবাব নাই।

সহসা তাহার মনে হইল আগন্তুক যদি তাহার দিদি না হয় ? কথাটা মনে হইতেই তাহার যেন পা পর্য্যন্ত হিম হইয়া উঠিল। সে প্রাণপণে তবু একবার ডাকিল,—দিদি এলে ?

তবুও সাড়া নাই। কিন্তু পায়ের শব্দ বিছানার কাছেই আসিতেছে ক্রমশঃ। হয়ত দিদি তাহার সঙ্গে রসিকতা

করিতেছে। সে চরম সাহসে ভর করিয়া কহিল, দিদি ভয় দেখাচ্ছিস বুঝি ?

তবুও জবাব নাই। তাহার কান্না পাইতে লাগিল। সে মরীয়া হইয়া লেপটা মুখের উপর টানিয়া কাঠ হইয়া পড়িয়া রহিল। পায়ের শব্দ কিন্তু এবারে একেবারে বিছানার পাশে আসিয়া থামিল। তারপরই মনে হইল কে যেন লেপের উপর হাত দিয়া কি খুঁজিতেছে—

আর সে চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না, প্রথমে সে লেপের বাহিরে হাত দিয়া আগন্তুককে অনুভব করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহার গায়ে ঠেকিতেই একটা চট্‌চটে তরল কোন জিনিস হাতে লাগিয়া গেল। সে অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া কোনও রকমে বিছানার অপর পাশ দিয়া নামিয়া পড়িল। তারপরে আন্দাজে দেওয়ালের কাছে গিয়া হাতড়াইয়া সুইচটি খুঁজিয়া বাহির করিল।···সঙ্গে সঙ্গে ঘর আলোয় ভরিয়া উঠিল···

বিছানার পাশে দাঁড়াইয়া তাহার বড়বোনই বিছানা হাতড়াইতেছে, কিন্তু তাহার গলার এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত কে কাটিয়া দিয়াছে, সমস্ত শরীর রক্তে ভাসিতেছে; একটা চীৎকার করিয়া উঠিয়াই সে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেল।···

পরের দিন ভোর বেলা তাহার বাবা ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন একটি কন্যার মৃতদেহ মেঝেয় পড়িয়া, অপর মেয়েটি ঘোর উন্মাদ অবস্থায় বিছানায় পড়িয়া প্রলাপ বকিতেছে···

আর খোঁজ খবর করিয়া জানা গেল সেই দিনই রাত্রে নিকটস্থ পাগলা গারদ হইতে একটি পাগল পলায়ন করিয়াছিল,

তাহাকে সম্প্রতি আবার ধরা হইয়াছে, তাহার হাতে একটা রক্ত-মাখা ক্ষুর।

বড় মেয়েটির গলা কাটিয়া দিয়া হয়ত সে বাহির হইয়া গিয়াছিল কিন্তু সেই অর্দ্ধমৃত অবস্থাতেও বড় বোন ছোট বোনকে সতর্ক করিতে আসিয়াছিল···কোন এক অসাধারণ ইচ্ছাশক্তির বলে।

* * * *

অত্যন্ত বিশ্রী গল্প !

সুধাংশুর অত্যন্ত রাগ ধরিতে লাগিল সুধীরের উপর। এ নিশ্চয়ই তাহার সয়তানী, বিশেষ করিয়া এই বই-ই এখানে রাখার আর কি উদ্দেশ্য থাকিতে পারে ? সে রাগ করিয়া বইটা ছুঁড়িয়া ফেলিল টেবিলের উপর···এবং সেই বই লাগিয়াই বাতিটি টুপ্ করিয়া পড়িয়া নিভিয়া গেল।

দেশলাই নাই। এটাও বদ্‌মায়েসী, কেন রে বাপু, কেরোসিনের আলো দিলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হইত ? অন্ততঃ দেশলাই একটা···

কিন্তু সে যাহাই হউক, সেই নিবিড় অন্ধকারে বসিয়া কেমন যেন একটা অস্বস্তি বোধ হইতে লাগিল। সে হাত বাড়াইয়া রিভ্‌লবারটা মুঠা করিয়া ধরিয়া বিছানায় গিয়া বসিল এবং সেটিকে সযত্নে বালিশের নীচে রাখিয়া শুইয়া পড়িল।

এ কথা-সে কথা নানারূপ চিন্তার মধ্যে কখন যে তাহার মন ঐ গল্পটির কথা ভাবিতে সুরু করিয়াছে তাহা সে জানিতে পারে নাই, সহসা তাহার বীভৎস পরিসমাপ্তিতে সারা দেহ শিহরিয়া উঠিতে তাহার খেয়াল হইল, সে 'ধ্যেৎ' বলিয়া যেন জোর করিয়া সেই বিশ্রী চিন্তাকে মন হইতে দূর করিয়া

দিল, তাহার পর বালিব্রীজের কথা, পাটের দরের কথা, টাটার ডিভিডেণ্ট প্রভৃতি ভাবিবার চেষ্টা করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িল।

বোধ হয় আধঘণ্টাও ঘুমায় নাই—কী একটা যেন শব্দে তাহার সমস্ত তন্দ্রালুতা চলিয়া গেল। কারণ ইহার একটু পূর্ব্বেই সে স্বপ্ন দেখিতে ছিল একটি মুণ্ডহীন দেহ, বাংলায় যাহাকে স্কন্ধকাটা বলে, যেন অন্ধকারের মধ্যে তাহাকে জড়াইয়া ধরিতে আসিতেছে।

আবারও একটা শব্দ, খুব সামান্য, কিন্তু পরিষ্কার ! সে সোজাসুজি উঠিয়া বসিল।

মুখচোখে প্রথমটা কিছুই ঠাওর হইল না। পরে যখন চোখ কতকটা অভ্যস্ত হইয়া আসিল, তখন সেই অন্ধকারেই যেন একটা কৃষ্ণবর্ণ কোনও বস্তুর অস্তিত্ব অনুভব করিল। সে বস্তুটা যেন ওধারের কোণে, কিন্তু খুব ধীরে ধীরে কাছে আসিতেছে—

জানালা দিয়া যেটুকু নক্ষত্রের আলো আসিতে পারিত তাহাও বৃহৎ কাঁঠাল গাছে বাধা পাইয়া ফিরিতেছে। আর একবার দেশলাই-এর শোক তাহার প্রবল হইয়া উঠিল। অস্ফুটস্বরে সুধীরের সম্বন্ধে একটা কটূক্তি করিয়া বালিশের নীচে হইতে রিভলবারটা বাহির করিয়া লইল, তারপর প্রশ্ন করিল, কে ?

সহসা যেন সেই অজানিত বস্তুর অগ্রগমনে বাধা পড়িল, কিন্তু সে ক্ষণিক মাত্র—একটু পরেই আবার সে অগ্রসর হইতে লাগিল। অতি ধীরে, অতি নিঃশব্দে !

সহসা সুধাংশুর মনে হইল, সে ভয় পাইতেছে। পরক্ষণেই

সে শব্দ করিয়া হাসিল। কহিল, কে বাবা তুমি? মিছে আমায় ভয় দেখাবার চেষ্টা করছ কেন?

কোনও জবাব নাই।

কপালে যেন ঘাম দেখা দিল। কিন্তু সে ভয়ে নয় নিশ্চয়ই! যে গরম, ঘাম ত হইতেই পারে। বুকের মধ্যে একটু দ্রুততর হৃদ্‌স্পন্দনের আভাস পাওয়া গেল। ভয়?... পাগল নাকি? তাহার আবার ভয়!

কিন্তু কী ওটা? সাড়া দেয় না কেন? তাহার রাগ ধরিল, একটু যেন উষ্ণকণ্ঠেই কহিল, যে-ই হও চট্‌পট্‌ সাড়া দাও। নইলে ভাল হবে না—

তবুও সেই নিঃশব্দ অগ্রগতি, অমোঘ, শান্ত। নিজের অজ্ঞাতসারেই সুধাংশু একটু পিছনে সরিয়া বসিল। সহসা তাহার গল্পটির কথা মনে পড়িল। ছোট বোন্‌টির অবস্থার কথা—

পিঠে শিরদাঁড়ার কাছ হইতে একটা হিম শৈত্য যেন পায়ের কাছে নামিতে লাগিল, সে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, সাড়া দাও বল্‌ছি শিগ্‌গির! নইলে আমি গুলি করব। আমায় ভয় দেখাবার চেষ্টা বৃথা, আমি ভয় পাবার ছেলে নই দেখ্‌তেই পাচ্ছ।

তবুও সাড়া নাই।

আর একটু পিছাইয়া সুধাংশু কহিল, সাড়া না দাও না-ই দিলে কিন্তু কাছে এগোচ্ছ কেন? দাঁড়াও, দাঁড়াও বলছি, এখনো দাঁড়ালে না? আমি কিন্তু গুলি করব। তিন পর্য্যন্ত গোনার সঙ্গে সঙ্গেই গুলি করব, তা ব'লে দিচ্ছি—

তবুও সে অগ্রসর হইতেছে, অদৃষ্টের মতই তাহার গতি ধ্রুব।

—এক !

--দুই !

—এখনো সরলে না ?…তিন—

দ্রুম্ !

সুধাংশুর অব্যর্থ লক্ষ্যের খ্যাতি ছিল। গুলি সেই অন্ধকারময় জীবের বুকের ভিতর দিয়া চলিয়া গেল। কারণ এখন তাহাকে মনুষ্যাকৃতি বলিয়াই বোধ হইতেছে।

কিন্তু তবুও সে কাছে আসিতেছে বিছানার কাছে। এবার সুধাংশু নিজের কাছে স্বীকার করিতে বাধ্য হইল যে সে ভয় পাইতেছে। তাহার কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া উঠিল, সারা দেহ যেন অসাড় হইয়া আসিল—

—এখনও থামলে না ?

সে আবার গুলি করিল। এক, দুই,—কিন্তু তবুও সে রহস্যময় আগন্তুকের গতিতে বাধা পড়িল না। বরং যেন এইবার সে তাহারই দিকে হাত বাড়াইতেছে বলিয়া মনে হইতেছে, আলিঙ্গনের মত।

সে বিছানার শেষ প্রান্তে সরিয়া গেল। ওধারে দেওয়াল, সম্মুখে প্রসারিত বাহু-বিভীষিকা। সে পাগলের মত উপর্যুপরি অবশিষ্ট তিনটি গুলিই ছাড়িল। আর গুলি নাই, ছ'ঘরা পিস্তলের শেষ গুলিটি বাহির হইয়া গেল। তবুও সেই অশরীরী প্রেতমূর্ত্তি তাহাকে আলিঙ্গন করার জন্য হাত বাড়াইতেছে।

আরও কাছে---আরও---

সুধাংশু বিকট চীৎকার করিয়া উঠিল।

* * * *

অনাবৃত দেহে ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে সুধীর ছুটিয়া ঘরে ঢুকিল। কহিল, সর্ব্বনাশ হ'য়েছে, সুধাংশু কোলাপস্ করেছে।

—সে কি ?

সুধীর তখনও হাঁপাইতেছিল, কহিল, এ যে এত নার্ভাস তা আমার জানা ছিল না।

—এখন উপায় ?

—উপায় কিছু নেই। পালাতে হবে।

শৈলেশ তখনও একটু ইতস্ততঃ করিতেছিল, কহিল, ডাক্তার ডাকলে হোত না ?

সুধীর কহিল, খুনের দায়ে পড়বার জন্য ? চল—চল—

বৎসর তিনেক পরে রাঁচীতে এক চায়ের দোকানে সুধীর ও শৈলেশ বসিয়া চা খাইতেছিল।

পরের দিন হুড্রু দেখিতে যাইবার আলোচনা হইতেছে ও তাহার সঙ্গে এক-এক চুমুক চা চলিতেছে, এমন সময় সহসা শৈলেশের হাত হইতে এক ঝলক গরম চা ছিটকাইয়া পড়িল সুধীরের কোলে। সুধীর একটা ভাল রকমের কটূক্তি করিতে গিয়া শৈলেশের মুখের দিকে চাহিয়া সে কথা ভুলিয়া গেল। কারণ শৈলেশের মুখ ছাইয়ের মত সাদা হইয়া গিয়াছিল, হাত-পা ঠক-ঠক করিয়া কাঁপিতেছিল। কিন্তু পরক্ষণেই শৈলেশের দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া দোকানের প্রবেশ-

পথের দিকে চাহিয়া সে-ও যেন নিমেষে পাষাণে পরিণত হইয়া গেল।

সুধাংশু স্মিতমুখে দোকানে ঢুকিয়া তাহাদেরই টেবিলের দিকে অগ্রসর হইতেছিল।

শৈলেশ অস্ফুটস্বরে কহিল, তুই বেঁচে আছিস এখনও ?

সুধাংশু কহিল, কেন ? তোরা কি ভেবেছিলি, আমি ম'রে গেছি।

সুধীর কহিল, প্রায় তাই। তোর যে সবটাই বড়াই, তুই যে অত ভয় পাবি তা কে জানত। তারপর থেকে আমি আর কারুর দিকে যেন চোখ তুলে চাইতে পারিনে—

সুধাংশু শৈলেশের ডিস্ হইতে খানিকটা মাম্‌লেট তুলিয়া চিবাইতে চিবাইতে কহিল, সেদিনের ব্যাপারটা কি বল্ দেখি ? আমার কিছু মনে পড়ে না, খালি মাঝে-মাঝে মনে হয় যেন একটা কন্ধকাটা ধড় দু'হাত বাড়িয়ে গলা টিপ্‌তে আসছিল।

সুধীর কহিল, কন্ধকাটা না হাতি ! আমিই একটা কালো কাপড় মুড়ি দিয়ে ভয় দেখাচ্ছিলুম।

শৈলেশ কহিল, বাড়ীটাও ওর মাসীর নয়। খালি বাড়ী অনেক দিন প'ড়ে আছে, ওটা বিক্রীর বিজ্ঞাপন দেখে ও দেখতে গিয়েছিল। তোর সঙ্গে তর্ক করতে ওর সে কথা মনে পড়ে। আমি আবার অতশত জানতুম না। তুই চ'লে গেলে সুধীর আমায় মতলবটা খুলে বললে, খালি বাড়ীটা একজন খদ্দেরকে দেখাব বলে চাবি চেয়ে নিয়ে নিজেরা গিয়ে ঐ ঘরটা বেছে সব যোগাড় ক'রে রেখে আসি। বাতির মতলবও সুধীরের, জান্‌ত যে এম্‌নিই ওটা নিভ্‌বে নইলে তুই ঘুমিয়ে পড়লে পা-টিপে-টিপে গিয়ে নিভিয়ে দেওয়া যাবে।

সুধীর কহিল, গল্পটা ইচ্ছে ক'রেই লাল দাগ দিয়ে রেখেছিলুম।···সেই সময়টায় টাকার বড্ডই দরকার ছিল, ভেবেছিলুম দু'শো টাকা পেলে অনেক উপকার হবে। তা তুই অজ্ঞান হ'য়ে গিয়ে সব মাটি করলি; আমি নাকের ডগায় হাত দিয়ে দেখলুম, যেন মনে হোল নিশ্বেস নেই, তখন ভয় পেয়ে দুজনেই পালালুম।

সুধাংশু একদৃষ্টে সুধীরের মুখের দিকে চাহিয়া ছিল, যেন নিশ্বাস রোধ করিয়া তাহার কথা শুনিতেছিল, কহিল, কিন্তু আমি যে গুলি ক'রেছিলুম—

সুধীর হাসিয়া কহিল, ওসব ফাঁকা। কার্তুজ আমি আগেই বার ক'রে নিয়েছিলুম।

ভীত শৈলেশ কোনও প্রকার বাধা দিবার আগেই সুধাংশুর বজ্রমুষ্টি সুধীরের গলায় চাপিয়া বসিল। তখন সে এক হৈ হৈ ব্যাপার। উপস্থিত খরিদ্দার ও দোকানদাররা মিলিয়াও ছাড়াইতে পারে না, এমনিই সে বজ্রমুষ্টি। সুধীর অসহায়ের মত পা ছুঁড়িতেছিল, কিন্তু সুধাংশুর বিপুল শক্তির কাছে তা কতটুকু ?

ঠিক সেই সময় পাগলা-গারদের জন দুই তিন রক্ষী সেখানে আসিয়া পড়িল। তাহারা অনেক কষ্টে তাহাকে ছাড়াইয়া লইয়া হাতে হাতকড়া পরাইয়া দিল। সুধাংশুর চোখ দু'টি তখনও জ্বলিতেছে—

একজন রক্ষী কহিল, একটু ফাঁক পেয়েছে কি অমনি পালাবে। আর এধারে ত বিশেষ ক্ষ্যাপামি নেই, দিব্যি মানুষটি, কাজেই আমরা বিশেষ কড়াকড়ি করি না। শুধু মাঝে মাঝে হঠাৎ ক্ষেপে গিয়ে লোকের গলা টিপে মারতে

যায় আর সেই সময় কি সব ভুল বকে।…চল হে, চল—

সুধাংশুর চোখের দীপ্তি ততক্ষণে নিভিয়া গেছে, সে ভাল মানুষের মত উহাদের সঙ্গে যাইতে যাইতে অস্ফুট স্বরে কহিল, দিদি ভারি ভয় দেখায়, কেবল গলা টিপে মারতে আসে, আমি কি করব ?…

সুধীর তখনও অর্দ্ধমৃতাবস্থায় পড়িয়া হাঁপাইতেছিল। *

---

*এই গল্পটি বিলাতী গল্পের কঙ্কালের উপর গঠিত।

এক রাত্রির অতিথি

বুড়ো মাঝিটাকে তাড়া লাগানো বৃথা জেনেই অনিমেষ বহুক্ষণ আগেই চুপ করেছিল। তার ফলে মাঝি আর আরোহী দুজনেই হাল ছেড়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বসেছে। মাঝির বকাটাই রোগ—এমন কি ভাবভঙ্গী দেখে মনে হচ্ছিল ঐটেই পেশা। ওর বৌ কতদিন মরেছে, ছেলের বিয়ে দিয়ে কী ভুল করেছে, জামাই কেন মেয়েকে নেয় না—ছোট জামাইটা জুয়াড়ী, ছেলেটা নেশা করতে পেলে আর কিছু চায় না—খুব ছেলে বয়সে একবার ও কলকাতা গিয়েছিল কিন্তু অত হট্টগোলে মাথা ঠিক থাকে না বলে পালিয়ে আসতে পথ পায়নি—আবার একবার যাবো মা কালীকে দর্শন করতে, ইত্যাদি তথ্য পরিবেশন করবার ফাঁকে ফাঁকে শুধু মাত্র দম নেবার প্রয়োজনে যখন থামে তখনই শুধু দাঁড় বাইবার কথা মনে পড়ে ওর। সুতরাং সহরে যাবার বাস্ যে পাবে না তা অনিমেষ আগেই ভেবেছিল, কিন্তু এমন অবস্থায় যে পড়বে তা কল্পনা করেনি। বাস্ ত নেই-ই, আশে পাশে কোথাও মানব-বসতির চিহ্নও যেন চোখে পড়ে না।

নৌকো এসে যেখানটায় ভেড়ে সেখানে বাঁশের মাচা মত একটা আছে, জাহাজঘাটা হলে অনায়াসে জেটি বলা যেত। সেই মাচাতে নেমে অসহায় ভাবে অনিমেষ একবার চারিদিকে তাকিয়ে দেখলে। নীচে ময়ূরাক্ষীর কালো জল নিঃশব্দে বয়ে যাচ্ছে। তার স্রোতের গতি থাকলেও তবু একটু প্রাণ-স্পন্দন বোঝা যেত—এত মন্থর তার স্রোত, এত নিস্তরঙ্গ যে

মনে হচ্ছে সমস্ত জলটা যেন জমাট বেঁধে স্তব্ধ হয়ে গেছে—আর তার সেই অতল কালো বুকে কত কী রহস্যময় জীব স্পন্দনহীন চোখে তার দিকে তাকিয়ে কৌতুকের হাসি হাসছে—

ওপারে ভগীরথপুর গ্রাম, বেশ সম্পন্ন গ্রাম তা সে জানে, বহু লোকের বাস, অনেক পাকা বাড়ী ইস্কুল ডাকঘর আছে কিন্তু এখান থেকে তার কিছুই দেখা যায় না। ঘাট থেকে উঠে যে রাস্তাটা গ্রামের দিকে গিয়েছে তার সাদা বালির আভাস নিবিড় বনের অন্ধকারে মিশে গেছে একটু খানি গিয়েই। দু'দিকে বড় বড় গাছ—কী গাছ তা বোঝা যায় না, কিন্তু তারই অসংখ্য শাখাপল্লব সমস্ত গ্রামটাকে যেন চোখের আড়াল করে রেখেছে। একটা আলোর রেখা পর্য্যন্ত চোখে পড়ে না।

ওপারেই যদি এই হয় ত এপারের অবস্থা সহজেই অনুমেয়। এপারে যেদিন সে এসেছিল সেদিন দিনের বেলাও কোনও গ্রাম ওর চোখে পড়েনি। বাস্‌টা এসে একেবারে এই ঘাটের ধারে দাঁড়ায়, যাত্রীরা সবাই ভগীরথপুর চলে যায়। সেদিন অন্তত এমন কেউ ছিল না যে এপারে কোথাও যাবে। সেদিনও দুদিকে আম গাছের ঘন বন কাটিয়ে এসেছিল—বেশ মনে আছে। হয়ত ছিল কোথাও ঘরবাড়ী কিন্তু তা ওর চোখে পড়েনি।

পারাপারের জন্য একটা খেয়া নৌকা আছে, চওড়া ভেলার মত প্রকান্ড বস্তু কিন্তু শেষ বাস্ চলে যাবার পর আর ওপার থেকে কেউ আসবার সম্ভাবনা নেই জেনে সে ইজারাদারও বহুক্ষণ বাড়ী চলে গেছে নৌকোটা ওপারে বেঁধে রেখে।

"বাবু ভাড়াটা ?"—তাড়া লাগায় মাঝি।

বিহ্বলতা কাটে কিন্তু যেন আরও ব্যাকুল হয়ে ওঠে অনিমেষ।

"ভাড়াটা কিরে! এই অন্ধকার রাত্রিতে আমি এখানে কোথায় থাকব। তুই ত এক ঘণ্টার রাস্তা সাত ঘণ্টায় এসে আমাকে এই বিপদে ফেল্‌লি। এখন নিদেন ওপারে পৌঁছে দে। দেখি কোথাও একটু আশ্রয় পাই কি না, এপারে এই জঙ্গলে শেষে কি বাঘের পেটে প্রাণ দেব। চল, ওপারে নিয়ে চল্‌—"

"উটি লারলম্‌ আজ্ঞা !"

"সে কি! কেন রে? কী হয়েছে ?"

তার উত্তরে মাঝি যা বললে তার অর্থ হচ্ছে এই যে, ওপারে অন্য নৌকো গেলে খেয়ার ইজারাদার বড্ড বকাবকি করে, পুলিশে ধরিয়ে দেয়। সুতরাং ওপারে যাওয়া ওর পক্ষে সম্ভব নয়।

অনিমেষ তাকে অনেক করে বোঝাল। ওপারে তোকে ধরবার জন্য ইজারাদার যদি বসে থাকত ত অনিমেষ তাকেই ডাকত; শুধু ইজারাদার কেন জনমানবের চিহ্ন থাকলেও সে মাঝিকে এ অনুরোধ করত না। কোন মতে নামিয়ে দিয়ে সে চলে যাক্‌—তাতে যদি কেউ তাকে ধরে ত অনিমেষ তার দায়ী—ইত্যাদি সব কথার উত্তরে তার সেই একই উত্তর "উটি লারলম্‌ আজ্ঞা !"

অনিমেষ তখন রাগ করে বললে, "তবে তুইও থাক্‌, আমি তোর নৌকোতেই রাত কাটাই।"

"আজ্ঞা, উটিও লারলম !" শুধু তাই নয়, দাঁড়ের একটা

ধাক্কা দিয়ে নৌকোটা খানিক দূরে সরিয়ে নিয়ে গেল।

"টাকাটি ছুঁড়ে দ্যান্ কেন—বাড়ী চলে যাই।"

"তবে টাকাও পাবি না যা!" রাগ করে বলে অনিমেষ, কিন্তু যখন দেখে বুড়োটা সত্যি-সত্যিই একটা নিঃশ্বাস ফেলে ঘর-মুখো হচ্ছে তখন সে একখানা এক টাকার নোট দলা পাকিয়ে ছুঁড়েই দেয়।

"যা বেটা যা। পথে ডুবে মরিস ত ঠিক হয়।" মনে মনে বলে অনিমেষ।

ব্যস্। এরপর সব পরিষ্কার। ওপারে ঘন বনের নিবিড় তমিস্রা, সামনে অতল শান্ত জলে তারই রহস্য আছে জমাট বেঁধে—আর এপারে তার চার পাশ ঘিরেও দৈত্যের মত কতকগুলি গাছপালা ভয়াবহ অন্ধকার বিস্তার করে সমস্ত সভ্যতার চিহ্ন এমন কি আকাশকেও যেন আড়াল করে রেখেছে। বাস্ এসে দাঁড়ায় এবং ঘোরে যেখানটায় সেখানে খানিকটা ফাঁকা জায়গা আছে বটে কিন্তু সে যেন আরও ভয়ঙ্কর।

স্যুটকেসটা মাথার উপর পেতে সেখানেই জেঁকে বসল অনিমেষ। বাঘ ভাল্লুক যদি সত্যিই আসে ত জলে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারবে—এখানেই খানিকটা তবু নিরাপদ।

খর্ খর্ ঝট পট শব্দ করে কী একটা পাখী উড়ে বসল মাথার ওপরে। ভয় পেয়ে চমকে উঠল অনিমেষ। কাছেই কোথায় শুকনো পাতার ওপর দিয়ে কী একটা সরীসৃপ চলে গেল বোধ হয়। সামান্য শব্দ তবু বেশ স্পষ্ট। জলের মধ্যে হঠাৎ একটা মাছ ডিগবাজী খায়। ঐটুকু আওয়াজ—কিন্তু অনিমেষের মনে হল যেন বন্দুকের শব্দ হল কোথায়।

বিশ্রী লাগছে। নক্ষত্রের আলোতে যতদূর দৃষ্টি চলে বহুক্ষণ ধরে ধরে হাত ঘড়িটা দেখলে মাত্র রাত ন-টা। কলকাতায় সবে সন্ধ্যা। কিন্তু এখানে মনে হচ্ছে নিশুতি রাত। এখনও দীর্ঘ সময় তাকে এখানে অপেক্ষা করতে হবে। কখন ভোর হবে, তারপর কখন ইজারাদারের ঘুম ভাঙ্গবে তবে সে একটু লোকালয়ের মুখ দেখতে পাবে। বাস্ একটা আসে এখানে সকাল আটটা নাগাদ—সন্ধ্যাতে যেটা এসেছে সেটা কাছাকাছি কোন গ্রামে থাকে, সাতটা নাগাদ এখানে এসে দাঁড়ায়। অর্থাৎ প্রায় বারো ঘণ্টা এখনও—

আচ্ছা, হাঁটলে কেমন হয় ? বাসের রাস্তাটা ধরে হাঁটতে থাকলে কি আর গ্রাম একটা পাওয়া যায় না কাছাকাছির মধ্যে ?

কিন্তু সেখানে যদি তাকে আশ্রয় দিতে কেউ না চায় ? ডাকাত বলে মনে করে ? তাছাড়া দু'দিকে যা ঘন বন, যদি বাঘ আসে ? মুর্শিদাবাদ জেলায় এসব অঞ্চলে প্রায়ই বাঘ বেরোয়।

দরকার নেই। দশ এগারো ঘণ্টা সময়—একরকম করে কেটেই যাবে।

"ও মশাই শুনছেন ? বাস্ মিস্ করেছেন বুঝি ? কোথাও আশ্রয় পাননি ?"

অস্ফুট একটা শব্দ ক'রে চম্‌কে ওঠে অনিমেষ, বরং আঁৎকে ওঠে বলাই ঠিক্। কখন নিঃশব্দে কে পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে—কৈ একটুও ত টের পায়নি ! সামান্য কুটো নড়ার শব্দের দিকেও ত সে কান পেতেছিল।

কয়েক মুহূর্ত যেন ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে থাকে, ঘাড়

ফেরাতেও সাহস হয় না। কথাগুলো যে বলেছে সে একেবারে ওর পিছনে এসেই দাঁড়িয়েছে। অত্যন্ত দ্রুত, যেন একটা কথা শেষ হবার আগেই আর একটা শুরু হয়েছে—এইভাবে পর পর তিনটি প্রশ্ন করে আগন্তুকটিও চুপ করে দাঁড়িয়ে নিঃশ্বাস ফেলছে।

অবশেষে প্রায় মরীয়া হয়েই অনিমেষ ফিরে তাকায়।

রোগা কালো গোছের একটি মানুষ, খুব বেঁটে নয়—তাই বলে ঢ্যাঙ্গাও বলা চলে না। উস্‌কো খুস্‌কো এক মাথা চুল ও ঘন দাড়ি গোঁফ। ঘন দাড়ি কিন্তু আবক্ষ বিস্তৃত নয়। মধ্যে মধ্যে কামানো বা ছাঁটা হয়—এমনি দাড়ি, খোঁচা খোঁচা। একখানা খাটো আধ ময়লা কাপড় পরনে—কোঁচার খুট গায়ে জড়ানো। মোটা ভুরুর আড়ালে কোটরগত চক্ষুর তীক্ষ্ন দৃষ্টি নিঃশব্দে শুধু মাত্র চাউনির দ্বারাই যেন অনিমেষের সমস্ত ইতিহাস পূর্ব্বাপর আয়ত্ত করবার চেষ্টা করছিল।...

"বলছিলুম যে আপনি বোধহয় কোথাও আশ্রয় পাচ্ছেন না—না ? তাহ'লে বরং চলুন না হয় আমার কুটিরেই–কোনমতে রাতটা কাটিয়ে দেবেন।"

হায়রে ! আগুল্‌ফ লম্বিত কুন্তলা বনমালা শোভিতা কপালকুণ্ডলারা শুধু উপন্যাসেই দেখা দেয় !

যাক্‌ গে, নবকুমারের অদৃষ্ট তার নয় তা ত বোঝাই যাচ্ছে। তাই বলে কি ওর চেয়ে ভদ্র চেহারার কেউ জুট্‌তে নেই ! এ লোকটাকে দেখেই যেন পাগল বলে মনে হয়–শেষ পর্য্যন্ত এর আশ্রয়ে গিয়ে কি আরও বিপদে পড়বে !

"কী বলেন ? যাবেন নাকি ?"

'আ-আপনি এখানে—মানে—' আমতা আমতা করে অনিমেষ।

'আমার এখানেই একটা ঘর আছে, এই যে'

লোকটা আঙ্গুল দিয়ে দেখায়।

সত্যিইত, এই ত, বলতে গেলে তার সামনেই পাড়ের ওপর একখানা খড়ের ঘর—ও অঞ্চলে যেমন হয় তেমনি। আশ্চর্য্য, এতক্ষণ তার চোখে কি হয়েছিল ?

লোকটি বোধ হয় তার মনের ভাব বুঝেই হেসে বললে, "ঘরে আলো ছিল না কিনা, তাই অন্ধকারে টের পাননি। আমিও বাড়ী ছিলুম না, নদীর ধার দিয়ে দিয়ে একটু বেড়াতে গিয়েছিলুম। অন্ধকারে একা একা বেড়াতে আমার বেশ লাগে।"

"এখানে বাঘের ভয় নেই ?"

"আছে বৈ কি। তবে আমার অত ভয় নেই।...মরবার ভয় করি না। করে লাভই বা কি বলুন, মরতে ত একদিন হবেই।"

না, লোকটাকে ঠিক পাগল বলে ত মনে হয় না !

"চলুন চলুন, ঘরে বসেই কথাবার্ত্তা হবে'খন।" লোকটা তাড়া লাগায়।

"চলুন" বলে স্যুট্‌কেসটা তুলে নেয় অনিমেষ।

একখানা নয়—দুখানা পাশাপাশি ছোট ঘর, সামনে এক ফালি দাওয়া। ভেতর দিকে আরও কি আছে তা ওর নজরে পড়ল না ! বেশ ঝকঝকে করে নিকানো, পরিচ্ছন্ন দাওয়া। লোকটি আগে আগে পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়ে "দাঁড়ান আলো জ্বালি" বলে ওকে দাওয়াতেই দাঁড় করিয়ে রেখে দোর খুলে

ভেতরে ঢুকল। তালা চাবির বালাই নেই, দোর শুধু ভেজানোই ছিল, ঠেলা দিতেই নিঃশব্দে খুলে গেল। ভেতরে ঢুকে আশ্চর্য্য রকম ক্ষিপ্রতার সঙ্গে একটা আলো জ্বেলে লোকটি বললে "আসুন—ভেতরে আসুন।"

ঘরে আসবাবপত্র বেশি ছিল না। একটি তক্তপোষের ওপর একটা মাদুর বিছানো,—শয্যা বলতে এই। একটা বালিশ পর্য্যন্ত নেই। একপাশে একটা দড়ি টাঙ্গানো তাতে খান্‌দুই কাপড়, তার মধ্যে একটা লাল—মেঝেতে জলের মেটে কলসী, একটা কাঁসার ঘটি এবং পিতলের পিলসুজে একটা মাটির প্রদীপ। এ ছাড়া আর কোথাও কিছু নেই।

"বসুন, বসুন। ঐ চৌকিটের ওপরই বসুন।"

তারপর খানিকটা নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে নিজের দুইহাত ঘষে কেমন এক রকমের বিচিত্র হাসি হেসে বললে, "ভাল বিছানা আমার নেই! ঐ সুটকেসটা মাথায় দিয়েই শুতে হবে।... আর খাবারও ত কিছু দিতে পারব না। ঘরে আমার কিছুই নেই।...আপনি মদ খান ?"

যেন একটা আকস্মিক উগ্রতা দেখা দেয় ওর প্রশ্ন করবার ভঙ্গীতে।

"না-না। রক্ষে করুন। কিচ্ছু ব্যস্ত হবেন না আমার জন্যে। আশ্রয় পেয়েছি এই ঢের।"

ঐ আশ্রয়টুকুই যা। বাঘ ভাল্লুকের হাত থেকে ত বাঁচলেন অন্তত।—তা আশ্রয় ভালই। ঘরখানা মন্দ নয়, কী বলেন ?'

বলতে বলতে হেসে ওঠে সে। সাদা ঝক্‌ঝকে দাঁত কালো দাড়ির ফাঁকে চক্‌চক্ করে।

অনিমেষের যেন ভালো লাগে না ওর ভাবভঙ্গী। আবারও

সেই সন্দেহটা মনে জাগে—পাগলের পাল্লায় এসে পড়ল না কি ?

"আপনি এখানে কি করেন ?"

"আপাতত কিছুই না। আচ্ছা বসুন। আমি আসি। মুখহাত ধোবেন নাকি ?"

ধুতে পারলে ভালই হ'ত কিন্তু অনিমেষের তখন নড়তে ইচ্ছে করছে না। সে বললে, "না—দরকার নেই।"

লোকটি বেরিয়ে গেল। অনিমেষ স্তব্ধ হয়ে বসেই রইল। ভালো বোধ হচ্ছে না ওর। কেমন যেন একটা অস্বস্তি হচ্ছে। কী করে লোকটা এখানে, এমন একাই বা থাকে কেন ? ঘরে কোন রকম কিছু খাবার নেই ত ও নিজে খায় কি ? চোর-ডাকাত নয় ত ? লোকজনকে ভুলিয়ে এনে শেষে—

ঈশ্বর বাঁচিয়েছেন---ব্যাগে ওর খানকতক পুরোনো কাপড়-জামা ছাড়া আর কিছুই নেই। পকেটেও মাত্র টাকা ছয়েক আছে। কিন্তু, একটু পরেই সমস্ত দেহ হিম হয়ে ওর মনে পড়ে...এই সব উদ্দেশ্যে যারা নিয়ে আসে ভুলিয়ে, টাকা না পেলে আরও হিংস্র হয়ে ওঠে। তা-ছাড়া মেরে ফেলে ত দেখবে কী আছে না আছে। ওদের দেশে একবার খুব ডাকাতের উপদ্রব হয়েছিল, তারা একটা লোককে খুন করার পর পেয়েছিল মাত্র একটি আধলা।

কখন গৃহস্বামী আবার নিঃশব্দে ওর কাছে এসে দাঁড়িয়েছে অনিমেষ টেরও পায়নি। যদিও খোলা দরজার দিকে চেয়েই বসেছিল সে। আশ্চর্য্য !

লোকটি বললে, "এখনই শুয়ে পড়বেন নাকি ? যদি ঘুম পেয়ে থাকে ত স্বতন্ত্র কথা। নইলে একটু বসি। কত-

দিন লোকের সঙ্গে কথা কইতে পাইনি। বলেন ত দুটো কথা কয়ে বাঁচি।...এখানে তেমন লোকজন ত নেই, আসেও না কেউ—"

অনিমেষ আবারও পূর্ব্ব প্রশ্নের জের টানলে, "তা এমন জায়গায় আপনি থাকেনই বা কেন ?"

সেই হাসি গৃহস্বামীর মুখে, তেমনি নিঃশব্দ হাসি, দাড়ির ফাঁকে শুভ্র দন্তের সেই বিজলী প্রকাশ।

"ভয় নেই। আমি চোর-ডাকাতও নই, পাগলও নই। ঘরে কিছু নেই মানে আমার কিছুর দরকার নেই। থাকারও দরকার হয় না আমার। কেন জানেন ?"

তারপর—যেন কতকটা অসংলগ্ন ভাবেই বলে ওঠে, "আমি সাধক। তান্ত্রিক সন্ন্যাসী।"

"সন্ন্যাসী ?" অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে চায় অনিমেষ।

অপ্রতিভ হয়ে লোকটি বলে, "না—সন্ন্যাসী মানে ঠিক অভিষিক্ত সন্ন্যাসী নই—তবে সাধক বটে।"

উবু হয়ে ঘরের মেঝেতেই বসল লোকটা, কিছুক্ষণ মৌন-ভাবে থেকে বললে "তাহলে আপনাকে বলেই ফেলি সেটা। কাউকে কখনও বলিনি, বলবার সুযোগও পাইনি বিশেষ। এই অঞ্চলেরই লোক আমি। বুঝলেন ? ছেলেবেলা থেকেই নানা বইতে তান্ত্রিক সন্ন্যাসীদের অদ্ভুত সব ক্ষমতার কথা পড়ে ঐ দিকে মনটা ঝোঁকে। মনে হ'ত আমিও ঐসব সাধনা করে সিদ্ধ হবো, তারপর প্রাণ ভরে পৃথিবীর সব ঐশ্বর্য্য ভোগ করব—আর আমাকে পায় কে! হায় রে, তখন কি আর জানতুম যে ভোগের উদ্দেশ্যে সাধনা করতে এলে সিদ্ধি ত দূরের কথা সমস্তই খোয়াতে হয় একে একে।"

এই পর্য্যন্ত বলে লোকটি চুপ করল। এতক্ষণ অনিমেষও অনেকটা সহজ হয়েছে। লোকটির ভাবভঙ্গী আর কথাবার্ত্তায় সত্য কথা বলছে বলে মনে হয়। দুশ্চিন্তা অনেকখানি কমে গেল ওর।

"বাড়ী আমার এ অঞ্চলে নয়। বাড়ী সেই পাঁচ থুপির কাছে। এখানে কেন এলুম ? বলছি দাঁড়ান।...বলেছি আপনাকে ছেলেবেলা থেকেই ঐ দিকে ঝোঁক গিয়েছিল। ইস্কুলের পড়া হ'ল না, তার বদলে যত সব ঐ ধরনের বই পড়তে লাগলুম। পড়তে পড়তে বিশ্বাসটা খুব পাকা হয়ে গেল। কিন্তু গুরু কৈ ? দু একটা সন্ন্যাসী যা হাতের কাছে পেলুম দেখলুম সব বাজে---কেউ কিছু জানে না। অথচ পথ দেখাবে এমন লোক না পেলে এগোব কি করে ?... মনটা বড়ই চঞ্চল হয়ে উঠল। খাবার চিন্তা ছিল না। মাথার উপর বাবা, বড় ভাই ছিল---জমিজমা তারাই দেখাশুনো করত। অবশ্য আমিও বকুনি খেয়েছি ঢের, কাজকর্ম্ম কিছু করি না বলে, কিন্তু সে সব গায়ে মাখিনি।

"তবে যত দিন যেতে লাগল মনটা ততই ব্যাকুল হয়ে উঠল। শেষমেষ আমার তেইশ-চব্বিশ বছর বয়সের সময়ে বাড়ী থেকে সামান্য কিছু টাকা নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম। বেশ বুঝেছিলুম ঘরে বসে আর কিছু হবে না।... এ তীর্থ ও তীর্থ ক'রে অনেক দেশেই ঘুরলুম। ভাল চাকরী বা ভাল বিয়ে করার অনেক সুযোগও পেয়েছিলুম, সংসার মশাই মায়ার ফাঁদ পেতে রেখে দেয় সারা জগতে---যাই হোক সেদিকে মন ছিল না বলে কেউ বাঁধতে পারলে না। কিন্তু আসল যা উদ্দেশ্য তাও কিছু হ'ল না।...এমনি ভাবে

যখন ক্রমশ হতাশ হয়ে উঠেছি তখন একদিন—বাড়ী ফেরার পথে বলতে গেলে বাড়ীর কাছে এসে হঠাৎ একজনকে পেয়ে গেলুম। বক্রেশ্বরের শ্মশানে এক সাধু থাকেন শুনেছি, উলঙ্গ থাকেন শ্মশানে শুয়ে, কেউ খেতে দিলে খান নইলে এমনি থাকেন। কাঁচা মাংস, পাতা লতা এমন কি বিষ্ঠা খেতেও তাঁর আপত্তি নেই বোধ হয়—এমন নিস্পৃহ তিনি।"

"খোঁজ করে গেলুম। প্রথম ত দেখাই পাওয়া যায় না। শেষে তিন দিন ধন্না দিয়ে পড়ে থাকতে দর্শন পেলুম। বিপুল দেহ, তীক্ষ্ন দৃষ্টি, পাগলের মত ভাবভঙ্গী—কিন্তু পাগল নন্। একদিন আমার চোখের সামনেই—দু'দিক থেকে দু'দল ভক্ত তাঁকে দর্শন করতে আসছে দেখে আমার চোখের সামনে শিয়ালের দেহ ধরে বনের মধ্যে গিয়ে সেঁধুলেন, কেউ আর খুঁজেই পেল না। বুঝলুম যে এতদিন ধরে যাকে খুঁজছিলুম এতদিন পরে তাকে পেয়েছি।"

অনিমেষের মনেও ততক্ষণে গল্প জমে উঠেছে। লোকটি থামতেই সে বললে, "তারপর ?"

"লোক ত পেলুম—তাকে ধরি কী করে ? কিছুতেই ধরা দেয় না। কিছু বলতে গেলে শ্মশানের পোড়া কাঠ তুলে তেড়ে আসে। একদিন খুব কান্নাকাটি করতে সব শুনলে মন দিয়ে, কিন্তু তারপর যা বকুনিটা দিলে, বললে ভাল চাস্ত এসব মতলব ছাড়। সাধনা করবি তুই, ঐ দেড় ছটাক কাঁপা নিয়ে ? তোর কাজ নয়—বুঝলি, মরবি একেবারে। তা ছাড়া ভোগ করবার জন্য এসব কাজ যে করতে আসে তার একূল ওকূল দুকূল যায়। রামকৃষ্ণ পরমহংসের গল্প পড়িসনি ? মাকে বলেছিল মা অষ্ট সিদ্ধাই দে--হৃদে বলছে চাইতে। মা বললেন,

কাল সকালে এর উত্তর পাবি। পরের দিন সকালে দোর খুলতেই নজরে পড়ল একটি মেয়েছেলে ঐ দিকে ফিরে শৌচ করতে বসেছে—পরমহংস অপ্রস্তুত হয়ে ফিরে এসে ভাগ্নেকে এই মারে ত এই মারে। বুঝলি—এমনি তুচ্ছ শুধু নয় ছোট জিনিস ওসব। ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যা—বিয়ে থা কর। ভগবানকে ডাক্, নয়ত কুলগুরুর কাছে দীক্ষা নিস্। অনেক কাকুতি মিনতি করলুম, বাবার আর দয়া হ'ল না। আমি কিন্তু মশাই হাল ছাড়লুম না। আমার তখন জেদ্ চেপে গেছে কি না।…ঐখানেই পড়ে রইলুম, বলতে গেলে না খেয়ে দেয়ে আর গোপনে ওঁর দিকে নজর রাখলুম। যদি আসল প্রক্রিয়ার কিছু হদিশ পাই—বুঝলেন না ? এতদিন কি আর বৃথাই এ লাইনে ঘুরেছি। আসল মানুষ না পাই, ওদের ভেতরের কথা কিছু কিছু জেনেছি বৈকি ! তারপর হ'ল কি মশাই, আরও দু একজন সাধক আর ভৈরবী ওখানে এল বাবার সঙ্গে দেখা করতে। গোপনেই এল কিন্তু আমি ত ঐখানেই পড়ে থাকি, আমাকে এড়াবে কি করে ?…ওঁদের পরপর কদিন চক্র বসল। তাও দেখলুম---মনে হ'ল যে আর কি, সব শিখে গেছি…ওখান থেকে রওনা হয়ে আর বাড়ী ফিরলুম না, নির্জ্জন স্থান অথচ শ্মশান, লোকালয় কাছে এই খুঁজতে খুঁজতে এখানে এসে পড়লুম। পথে নলহাটীতে একজন তান্ত্রিকের কাছে দীক্ষাও নিয়ে নিলুম।

'ও মশাই, এলুম ত এখানে। কিন্তু সাধনা আর হয় না। প্রথম দিন থেকে বিঘ্ন। উপকরণ জোটেত দিন পাই না, দিন পাই ত উপকরণ নেই—শেষে অনেক কৌশল করে অনেক নিচে নেমে যদিবা সব যোগাড় করলুম, মঙ্গলবার অমাবস্যার রাত

পেয়ে যেমন আসন করে বসেছি—কী বিঘ্ন। ধ্যানে মন দেব কি, কিছুতেই মন স্থির করতে পারি না…এখন এটা বাসের রাস্তা হয়ে শ্মশান এখান থেকে সরে গেছে, আগে এখানটাতেই শ্মশান ছিল, এখন যেখানে ঘর দেখছেন, এই যেখানে আমরা বসে আছি এইখানেই সেদিন আসন ক'রে বসেছিলুম—'

নিজের অজ্ঞাতেই অনিমেষ যেন একটু সরে বসে। তারপর বলে, 'আচ্ছা বিঘ্ন কি রকমের? ভয় পেলেন? শুনেছি ত এরকম সাধনায় বসলে প্রথম প্রথম নানা রকমের ভয় দেখায়—কিন্তু সেটা শুধুই পরীক্ষা করার জন্যে। আপনিও ত সেরকম শুনেছিলেন নিশ্চয় তবে ভয় পেলেন কেন?'

হাসল লোকটা আবারও। কাউকে ছেলেমানুষি করতে দেখলে বিজ্ঞ মানুষরা যেমন হাসে কতকটা তেমনি হাসি। বললে, 'জানে ত সবাই কিন্তু শোনা এক জিনিস আর অভিজ্ঞতাটা আর এক। তেমন অভিজ্ঞতা হ'লে বুঝতেন!… শুনবেন কেমন?…মড়ার বুকের ওপর বসেছি আসন করে, মড়ার খুলিতে ক'রে মদ খাচ্ছি—মনে ভয়ডর কিছুই নেই, এই বিশ্বাস হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সেই লোকেরই বুকের মধ্যে হিম হয়ে গেল সে সব শুনে। না, না, তেমন ভয়ানক কিছু নয়, প্রথম শুরু হ'ল শুধু ফিস্ ফিস্ কথার শব্দ, খিলখিল হাসি, চাপা হাসিই। ক্রমে সেইটাই বাড়তে লাগল। মনে হ'ল দশজন, বিশজন, একশজন—হাজার হাজার। আপনার চার পাশে যদি লক্ষ লোকের ফিস্ ফিস্ কথারই শব্দ হ'তে থাকে ত কেমন মনে হয়? আর তার সঙ্গে চাপা এক ধরনের খিলখিল হাসি। তবু আমি স্থির হয়ে আসনেই বসে রইলুম—নড়লুম না। যদিও কাজে আর মন দিতে পারলুম

না, এটাও ঠিক। তার পর মশাই---স্পষ্ট দেখতে লাগলুম শ্মশানের মাটি ফুঁড়ে ফুঁড়ে যেন মড়াগুলো উঠছে। কতকাল থেকে মরেছে সব---কত হাজার হাজার বছর ধরে। এক এক জনের বীভৎস চেহারা, রোগে যন্ত্রণায় বিকৃত মুখ। কেউ বা খুন হয়েছিল, কেউ বা ঠ্যাঙ্গাড়ের হাতে প্রাণ দিয়েছে, কেউ বা গলায়-দড়ির মড়া। ঠিক সেই অবস্থায় উঠেছে---তেমনি কন্দকাটা কিংবা হাড়গোড় ভাঙ্গা অবস্থায়। সকলেরই মুখে রাগ, চোখের দৃষ্টিতে আগুন। তারা সবাই আমার দিকে আঙ্গুল তুলে শাসাতে লাগল, পাপিষ্ঠ তুই এখানে কেন? শ্মশান অপবিত্র করতে এসেছিস্। চলে যা, দূর হয়ে যা। জানিস না এখানে আমরা পাহারা দিচ্ছি? মনে পাপ নিয়ে তুই এসেছিস শ্মশান জাগাতে? চলে যা---তার মধ্যে এক-জনের আবার শুধু কঙ্কাল, বোধ হয় তাকে পুঁতে রেখেছিল কোথাও মেরে---তারপর তাকে তুলে পোড়াতে হয়েছে।···সেটাই সবচেয়ে কাছাকাছি এল, মুখে সেই এক শব্দ, দূর হ! দূর হ! ভয় পেলুম খুব তবু জানি একবার ভয় পেলেই গেল---চির-কালের মত। প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠলুম, যাবো না, যাবো না। উঠব না আমি। ব্যস্---আর যায় কোথা, সেই কঙ্কালটা আরও এগিয়ে এসে তার সেই অস্থিময় আঙ্গুল কটা দিয়ে আমার গলাটা চেপে ধরলো। ওঃ, সে কী চাপ, যেন মোটা লোহার সাঁড়াশী। কত চেষ্টা করলুম মুক্ত হবার, কিন্তু সে বজ্র কঠিন মুষ্টি খোলে কার সাধ্য। দম বন্ধ হয়ে গেল, বুকে সে এক অসহ্য যন্ত্রণা---মনে হ'ল যেন দেহের প্রতিটি শিরা ফেটে যাচ্ছে।···আকুলি বিকুলি করতে লাগলুম এক ফোঁটা হাওয়ার জন্যে---সে হাওয়া চারিদিকেই রয়েছে তবু এক বিন্দু

বুকের মধ্যে নিতে পারলুম না। বরং আরও চেপে বসতে লাগল সেই সাঁড়াশীর মত আঙ্গুলগুলো।…'

'তারপর ?' রুদ্ধনিঃশ্বাসে প্রশ্ন করে অনিমেষ।

'তারপর ?' আবার সেই হাসি, 'তারপর আর কি, মুক্তি। সেই থেকে ঘুরে বেড়াচ্ছি এখানেই। কাজ নেই কামাইও নেই। জায়গাটার মায়া ছাড়তে পারিনা।…সব চেয়ে কষ্ট হয় কথা কইবার লোক নেই বলেই—'

'—কি—কিন্তু' কথা কইতে গিয়েও একটা অজ্ঞাত আতঙ্কে অনিমেষের যেন গলা কেঁপে যায়, 'আপনি মুক্তি পেলেন কি করে ?'

'তা আমিও জানিনা। এক সময় দেখলুম যে, আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি আমারই ভূতপূর্ব্ব আশ্রয় অর্থাৎ কিনা দেহ-টার পাশে। যারা এসেছিল তাদেরও ত কাজ শেষ, তারাও সব যে-যার মিলিয়ে গেছে। এক কথায় সব কিছুর শান্তি।'

তবু বুঝতে কয়েক মিনিট দেরি লাগে অনিমেষের, কথা কইতে গিয়েও গলার স্বর বিকৃত হয়ে যায়, 'তার—তার মানে কি ? আপনি কি বলতে চান যে আপনি তখন মা-মারা গেলেন ? আ-আপনি কি মড়া ?'

প্রশ্নের শেষ অংশটা আকস্মিক আর্ত্তনাদের মত চীৎকারে পরিসমাপ্ত হয়। কিন্তু প্রশ্ন সে করছে কাকে ? কেউত নেই। শুধু সে একা বসে আছে ঘরে, বাকী জিনিসগুলো ঠিক আছে, পিদিমটা তেমনি জ্বলছে। শুধু উঁচু হয়ে বসে যে লোকটা কথা বলছিল সে আর নেই—

কোথা দিয়ে গেল লোকটা, কখন উঠে গেল তার চোখের সামনে দিয়ে ?

বার বার এই ব্যাকুল প্রশ্ন ওর মনে উঠতে লাগল কিন্তু উত্তর দেবে কে ! খানিক পরে আসল প্রশ্নটা আবার প্রবল হয়ে উঠল, তাহলে কি লোকটা যা বলে গেল তাই সত্যি, ও লোকটা মানুষ নয়—অশরীরী, বিদেহী আত্মা ! খাবার কিছু লাগেনা ওর—বলেছিল বটে। মরবার ভয় নেই।

গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে অনিমেষের কিন্তু সে শিক্ষিত ছেলে, বিজ্ঞান-পড়া ছেলে। এসব মিথ্যা—কল্পনা, আত্ম-সম্মোহন বলেই জানে। সে বিশ্বাস করত না এ কথা যে, এই বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বসে সে ভূত দেখেছে।

আচ্ছা, ছায়া পড়েছিল কি ওর ? মনে করবার চেষ্টা করে অনিমেষ।

সত্যই কি—? না লোকটা তার সঙ্গে তামাশা করছে ? আগে যা ভেবেছিল তাই ? ডাকাত বা ঠ্যাঙ্গাড়ে জাতীয়—ভয় দেখিয়ে গেল এর পর কাজ হাসিল করা সোজা হবে ভেবে ?

মনকে প্রবোধ দেয় সে, এইটে হওয়াই সম্ভব। ভূত হলে আলোয় থাকবে কি করে ?…বদমাইস। আরও বেশি ভয় দেখাবার জন্যে ম্যাজিকওয়ালাদের মত চোখের নিমিষে সরে গেছে।

দোরটা বন্ধ করে দেবে নাকি ?

দেওয়াই উচিত।

পালাবে ?

কোথায় যাবে এই অন্ধকারে। আরও ত ওদের কবলে গিয়েই পড়তে হবে। সে দেখতে পাবেনা ওদের, ওরা দেখবে। তার চেয়ে দোর বন্ধ করে বসে থাকা মন্দ নয়—যা হবার হবে,

আলোত থাকবে এখানে। লোকগুলোকে চোখে দেখা যাবে।

অনিমেষ অতি কষ্টে উঠে দাঁড়ায়। হাতে পায়ে যেন জোর নেই। কোন মতে উঠে গিয়ে সন্তর্পণে দোরটা বন্ধ করে দিলে। ভাগ্যিস ভিতরে খিল আছে। বেশ মজবুত খিল। দেখে শুনে ভাল করে বন্ধ করে দিলে। যাক্ নিশ্চিন্ত।

কিন্তু একী ?

হঠাৎ আলোটা নিভে গেল যে ! মুহূর্ত্তের মধ্যে, কোন রকম নোটিশ না দিয়েই ঘরটা, তার চার পাশ নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে ভরে গেল। তেল ছিল না ? কিন্তু তাহলে ত একটু একটু করে ম্লান হয়ে আসবে—

তবে—ভয়ে ওর গা-টা হিম হয়ে গেল—তবে কি ঘরের মধ্যে কেউ ছিল ? এখন ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিলে ? সেই লোকটাই কি ? হয়ত তক্তপোষের নীচে ঢুকে গিয়েছিল তখন, সেইখানেই লুকিয়ে ছিল, তাই সে ওর চলে যাওয়াটা লক্ষ্য করেনি। নিশ্চয়ই তাই।

কী সর্ব্বনাশ ! এ যে হিতে বিপরীত হল। ওদের হাত থেকে বাঁচতে গিয়ে একেবারে ওদের মুঠোর মধ্যেই এসে পড়ল। পকেটেতে দেশলাই পর্য্যন্ত নেই। যতদূর মনে পড়ে ব্যাগও নেই। ব্যাগটাই বা কোথায় ? চৌকীটা যে ঠিক কোন্ দিকে, তাও মনে পড়ছেনা !

উঃ—কী বদমাইস্ লোকটা।

ক্রুদ্ধস্বরে, হয়ত বা একটু ভীত কণ্ঠেই অনিমেষ বলে উঠল, 'কে ? কে ওখানে ? আলো জ্বালো বলছি শিগগির, নইলে ভালো হবে না, দেখিয়ে দেব মজা। কে ? জ্বাললে না ?'

নিস্তব্ধ চারিদিকে। কোথাও একটা জনপ্রাণী আছে বলে মনে পড়েনা। রহস্যময় সুগভীর স্তব্ধতা।

ঘরে কি জানলা ছিল ? তাও ত মনে পড়ছে না ছাই।

জানলা খুলে দিলে তবু একটু নক্ষত্রের আলো আসে।

অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকেও জানলা কোন্ দিকে মনে পড়লনা। আচ্ছা, একটু এগিয়ে গেলেই ত দেওয়াল, হাৎড়িয়ে দেখতে দোষ কি !

পরক্ষণেই মনে পড়ল, আরে ! আচ্ছা বোকা ত সে ! দোরটাই ত রয়েছে, খুলে বেরিয়ে পড়লেই ত হয়। ঘরের অন্ধকারের চেয়ে বরং বাইরের অন্ধকার ভাল, নক্ষত্রের আলো আছে। ব্যাগটা ? থাকগে, প্রাণ ত বাঁচুক।

যেদিকে দোর দিয়েছে এই মাত্র, সেই দিকেই হাত বাড়াল। কৈ সে দরজা ? ও ত দরজা সবে বন্ধ করে এপাশ ফিরেছে আর আলো নিভেছে।

তবে কি ও দিক্‌ভুল করেছে ? এদিকে দরজা ছিল না ?

আন্দাজে আন্দাজে এগিয়ে যায় সে। এই টুকু ত' ঘর, দেওয়াল পেলে, দেওয়াল হাৎড়ে হাৎড়ে ঘুরলেই দরজা পাবে। শুধু ভয় হচ্ছে, ও লোকটা না এই সুযোগে পেছন থেকে মেরে বসে ! কিন্তু উপায়ই বা কি ? এদের কবলে যখন এসে পড়েইছে—

মরীয়া হয়েই এগোয় অনিমেষ। এক পা এক পা করে যতটা সম্ভব নিঃশব্দে এগোয়।…এক দুই…একি, এ যে কুড়ি পা হয়ে গেল। ঘরটা যতদূর আন্দাজ হয় দশবারো ফুটের বেশি হবে না লম্বায়। নেহাৎই ছোট্ট ঘর। অথচ কুড়ি পা মানে অন্তত পনেরো ফুট।

আরও দু পা...আরও দশ—আরও কুড়ি।

একি সে মাঠে চলেছে নাকি ?

কীরকম হ'ল ! চল্লিশ পা চলার মত ঘর ত নয়। কোণাকুণি হাঁটছে ? তাতেই বা এতদূর হবে কেমন করে ? তবু আরও কয়েক পা যায় সে। হয়ত চলতে চলতে কখন গতি বেঁকে গিয়েছে। সোজা হয়ে হাঁটে আরও খানিকটা।

না, তবু দেওয়াল নেই। রহস্যময়, অন্ধকার, অনন্ত শূন্যতা। বাইরের মুক্ত শূন্যতা নয়, চার দেওয়াল চাপা—তবু তা অনন্ত।

এইবার কপালে ঘাম দেখা দেয় অনিমেষের। এতক্ষণ ডাকাতের ভয়ে যা হয়নি এবার তাই হ'ল, পা দুটো কাঁপতে লাগল থর্ থর্ করে।...একেবারে যেন ভেঙ্গে এল। অসহায় ভাবে সেইখানেই বসে পড়ল।

এ তার কী হ'ল ! কী চক্রান্তে জড়িয়ে পড়ল সে ?

তবে কি সে লোকটা অশরীরী—সত্যি-সত্যিই ? সে কি তাহলে কোন প্রেতযোনির মায়াতে এসে পড়েছে ?

বিহ্বল হয়ে ভাবে অনিমেষ কি করবে কিন্তু কোন পথ দেখতে পায় না।

ঐ যে কারা আসছে না ? হ্যাঁ, ঐ ত কত লোকের পায়ের আওয়াজ। অন্তত আটদশ জনের কম নয়। কিংবা আরও বেশি। এই বাড়ীর কাছেই আসছে, ঐ ত দাওয়ায় উঠল।

'ও মশাই শুনছেন ? ও মশাই—'

গলা দিয়ে স্বর বেরোলনা। টাক্‌রা শুকিয়ে গিয়েছে। গলা কাঠ।

কিন্তু ওরাই যদি সেই ডাকাতের দল হয়, তা হোক্ তবুত তারা মানুষ। ভরসা হয় একটু অনিমেষের। তাহলে অন্তত এটা প্রেতের মায়া নয়। আঃ—বাঁচা গেল।

হ্যাঁ—ডাকাতই।

নইলে ওরা অমন ফিস্ ফিস্ করে কথা কইবে কেন? বহুলোক যেন পরস্পরের সঙ্গে ফিস্ ফিস্ করে কথা কইছে। আরও লোক বাড়ছে। আরও পায়ের শব্দ, বহু ফিস্ ফিস্ করে কথা বলার আওয়াজ—

এ কি—ওরা কি ঘরে ঢুকেছে নাকি?

কেমন করে ঢুকল?

ওর যে চারিদিকে শব্দগুলো এগিয়ে আসছে। ওরই চার পাশে, খুব কাছে। খিল খিল করে চাপা হাসির শব্দ—অনেকে হাসছে তবু শব্দটা খুব জোর নয়।

মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত বরফ নেমে যায় দেহের মধ্যে। হাত পায়ে আর কোন সাড় থাকে না। আতঙ্ক যে এমন জিনিস তা আগে অনিমেষ কল্পনাও করেনি। মস্তিষ্ক সুদ্ধ যেন নিষ্ক্রীয় হয়ে আসছে···

চীৎকার করবে? সাধ্য নেই। পালাবে? পথ কৈ?

কিন্তু কিছু ত একটা করা উচিত।

লোকগুলো যেন ওকে ঘিরে ধরেছে। তাদের নিঃশ্বাস, দূষিত তীব্র, উষ্ণ, নিঃশ্বাস ওর সর্ব্বাঙ্গে···

মনে পড়ে গেল লোকটার বর্ণনা। সেও ত এমনি ফিস্ ফিস্ শব্দ শুনেছিল, এমনি হাসি। তারপর? তারপর? সেই মৃতের পুনরুত্থান, সেই কঙ্কালের অভিযান।

তারও অদৃষ্টে কি তাই হবে? সে তো কোন দোষ

করেনি। সে তো সাধনা করতে আসেনি শবের বুকের ওপর চড়ে ?

অকস্মাৎ কে একজন হাঃ হাঃ করে হেসে উঠল তারই আশে পাশে কোথাও। তীক্ষ্ম চড়া গলায় সে হাসি মনে হল যেন তার চার পাশের অন্ধকারকে বিদীর্ণ করে ছড়িয়ে পড়তে চাইছে, আবার চারিদিকের দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসছে তারই চারিদিকে। বহুক্ষণ ধরে যেন সেই এক হাসির শব্দ ধ্বনিত আর প্রতিধ্বনিত হতে লাগল তাকে ঘিরে। বিশ্রী, তীক্ষ্ম একটা উপহাসের হাসি—সে হাসির জাল যেন তাকে চারিদিক থেকে বেড়ে ধরেছে, আর নিস্তার নেই।—

প্রাণপণ চেষ্টায় চীৎকার করে উঠল একবার অনিমেষ 'হে ভগবান, এ কী করলে !'

সত্যিই ত ! ভগবানের কথা ত তার মনে ছিল না। তাঁকে ত সে ডাকেনি।

'হে ভগবান, হে হরি, বাঁচাও—হে রামচন্দ্র ! আর কিছু মনে এল না তার। গায়ত্রী মনে আছে কি ? হাঁ আছে। পৈতেটা কোথায় ?…

সুগভীর ক্লান্তি আর অসহ তন্দ্রায় সমস্ত চৈতন্য শিথিল হয়ে আসে ওর।

ঘুম যখন ভাঙ্গল অনিমেষের তখনও সকাল হয়নি কিন্তু ফরসা হয়েছে একটু। খানিকটা সময় লাগল ওর সবটা মনে করতে তারপর ধড়মড়িয়ে উঠে বসে ভাল করে চেয়ে দেখলে যে সে বাস দাঁড়াবার ফাঁকা জায়গাটায় পড়ে ঘুমিয়েছে কখন—সুটকেসটা খানিকটা দূরে, একটা গাছ তলায় পড়ে আছে। সে ঘর ? যতদূর দৃষ্টি যায় কোথাও কোন ঘরের চিহ্নমাত্রও

নেই। হয়ত সবটাই ওর স্বপ্ন।

সে উঠে নদীতে গেল মুখ-হাত ধুতে।

এপার ও ওপার

নববধূকে লইয়া অসিত বাড়ী আসিয়া পেঁাছিল।

তাহার মা তখন মুখ গুঁজিয়া ঠাকুরঘরে অর্দ্ধমূর্চ্ছিতা অবস্থায় পড়িয়া আছেন। ঠিক ছয়মাস আগে এই মেয়েটির সহিতই অসিতের বড় ভাইয়ের বিবাহের সম্বন্ধ হইয়াছিল, দিনও স্থির হইয়া গিয়াছিল, এমন সময়ে একদিন পা পিছ্‌লাইয়া উঠানে পড়িয়া গিয়া অসিতের দাদা বিমলের মৃত্যু ঘটিল। সেই মেয়েই নববধূ রূপে আজ বাড়ী আসিল অথচ বিমল কোথায় ? পুত্রশোক যেন আজ একেবারে নূতন হইয়া তাঁহার বুকে বাজিয়াছে !

অসিতের এয়োস্ত্রী পিসিমা বর-বধূকে বরণ করিয়া তুলিলেন, কিন্তু তাঁহার মুখও যেন শোকার্ত্ত, গম্ভীর। অচলা কলিকাতার মেয়ে, শহরের কোলাহল-মুখরিত চপলতা হইতে মেঘাচ্ছন্ন সন্ধ্যায় নির্জ্জন পল্লীগ্রামের মধ্যে আসিয়া একেই তাহার মনটাও কেমন থম্‌থমে হইয়া গিয়াছিল, তাহার উপর বাড়ীসুদ্ধ লোকের স্তব্ধ-গম্ভীর ভাবে সে রীতিমত মুহ্যমান হইয়া পড়িল। এ-বাড়ীর ইতিহাস সে জানিত, কিন্তু ইহাদের বেদনা ঠিক কতখানি তাহা অনুভব করিবার বয়স তখন তাহার নয়।

অবশেষে অসিতের মা উঠিয়া আসিয়া বধূর মুখ দেখিলেন, কোনওরূপ মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানেরও ব্যতিক্রম ঘটিল না; কিন্তু উৎসব-গৃহের ভিতর ও বাহিরের সেই নিবিড় থমথমে ভাব কিছুতেই ঘুচিল না।

সেদিন কালরাত্রি, বর ও বধূর সাক্ষাৎ হওয়া সে-রাত্রে নিষেধ, সুতরাং স্থির ছিল যে, অচলা শাশুড়ীর সহিত শুইবে। কিন্তু অসিতের মা মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত পরদিনকার উৎসবের আয়োজন করিয়া অবশেষে ঠাকুরঘরে চলিয়া গেলেন, বধূ একাই রহিল। অচলা উপবাস পথশ্রম প্রভৃতির ক্লান্তিতে প্রথম রাত্রিতেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, তাহার শাশুড়ী আসিলেন কি-না টের পায় নাই; কিন্তু রাত্রি দুইটা নাগাদ অকস্মাৎ বাহিরে দমকা বাতাসের শব্দে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, সে উঠিয়া বসিল। ঘরের মধ্যে কেহ নাই, শুধু একটি তেলের আলো মিটমিট করিয়া জ্বলিতেছে; শাশুড়ী বোধহয় কপাট বন্ধ করিয়াই গিয়াছিলেন কিন্তু বাতাসে তাহাও খুলিয়া গিয়াছে। অচলার কেমন যেন ভয়-ভয় করিতে লাগিল; উঠিয়া গিয়া দুয়ার বন্ধ করিয়া আসিতেও সাহস হইল না, অথচ সেদিক হইতে চোখও ফিরাইতে পারিল না, কাঠ হইয়া বিছানার উপর বসিয়া রহিল।

এই ভাবে কিছুক্ষণ কাটিবার পর প্রথম ভয়ের বেগটা যখন কমিয়া গেল তখন সহসা তাহার মনে হইল যে কিছুক্ষণ ধরিয়াই একটা মিঠা ফুলের গন্ধ তাহার নাকে আসিতেছে; তখন সে ঘাড় ঘুরাইয়া দেখিল যে তাহার বিছানার উপরই হরেক রকম ফুল ছড়ানো রহিয়াছে, গন্ধরাজ, রজনীগন্ধা, বেল, জুঁই আরও কত কি! তাহার বিছানায় এত ফুল কে কখন

ছড়াইয়া দিয়া গেল ?···বিশেষ করিয়া এ তাহার শাশুড়ীর ঘর···এখানে···

তবে কি অসিত আসিয়াছিল ?···কথাটা মনে হইতেই লজ্জায় তাহার মুখ আপনা-আপনিই রাঙ্গা হইয়া উঠিল, একটু হাসিও পাইল। উঃ, কী লোভী মানুষ ! কালরাত্রির বিচ্ছেদও সহ্য হইল না !···কখন অসিত চুপি-চুপি আসিয়া তাহার বিছানার মধ্যে ফুলগুলি রাখিয়া গিয়াছে, হয়ত-বা তাহার নাম ধরিয়া আস্তে একবার ডাকিয়াও ছিল, সাড়া না পাইয়া আবার ফিরিয়া গিয়াছে, তাহার সেই নিঃশব্দ চৌর্য্য-বৃত্তি কল্পনা করিয়া অপূর্ব্ব মাধুর্য্য-রসে অচলার মন ভরিয়া উঠিল। নিশ্চয়ই সে এখনও জাগিয়া আছে···কিন্তু, না, তাহাকে অত প্রশ্রয় দেওয়া ভাল নয় ; অচলার ভয়-ডর তত-ক্ষণে সমস্তই চলিয়া গিয়াছিল; সে উঠিয়া আস্তে আস্তে ভিতর হইতে কপাটে খিল লাগাইয়া আসিয়া শুইয়া পড়িল। তাহার পর স্বামীর ক্ষুণ্ণ মুখ ও সস্নেহ অনুযোগ কল্পনা করিতে করিতে আবার কখন্ ঘুমাইয়া পড়িল তাহা সে নিজেও বুঝিতে পারে নাই।

উৎসব-বাড়ীর কলরব কানে যাইতেই ঘুম ভাঙ্গিয়া সে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল ; বাহিরের জানালা দিয়া প্রভাতের আলো আসিয়া পড়িয়াছে, ঘুম ভাঙ্গিতে বোধহয় আর কাহারও বাকী নাই। ছিঃ ছিঃ প্রথম দিনই উঠিতে তাহার এত বেলা হইল, গুরুজনেরা না জানি কি মনে করিতে-ছেন। ঘরে খিল দেওয়া, শাশুড়ী হয়ত প্রয়োজন সত্ত্বে ঢুকিতে পারেন নাই—

সে উঠিয়া তাড়াতাড়ি কাপড় জামা ঠিক করিয়া লইয়া

খিল খুলিয়া বাহির হইয়া পড়িল। অসিতের মা বাহিরেই ছিলেন, ঈষৎ অনুতাপের সুরে কহিলেন, রাত্তিরে ভয় পেয়ে দোর বন্ধ করেছিলে বুঝি মা ?···আমারই অন্যায়···আর কাউকে শুতে বললেই হোত, ঝি-টাকেও যদি বলতুম !

ভয়ই বটে ! ঘোমটার মধ্যেই কৌতুকহাস্যে অচলার মুখ ভরিয়া উঠিল, তাহার-পরই তাহার মনে পড়িল ফুলগুলির কথা; সে তাড়াতাড়ি বিছানার দিকে চাহিয়া দেখিল, কিন্তু কৈ ?···ফুলের ত চিহ্নমাত্রও নাই। অথচ কপাট ত এই মাত্র সে নিজহাতে খুলিয়া দিল, কে, কখন এবং কি করিয়া ফুল-গুলি লইয়া গেল ?

শাশুড়ী কাছে আসিয়া সস্নেহে তাহার বিবর্ণ-মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া কহিলেন, ইস্ এখনও ভয় যায় নি বাছার !··· কাল আমার মাথারও ঠিক ছিল না···বড্ড অন্যায় হয়ে গেছে !

তাহার পর একটা ছোট দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া তিনি কর্ম্মান্তরে চলিয়া গেলেন।

বৌভাত ও ফুলশয্যার হাঙ্গামা চুকিতে রাত্রি প্রায় দুইটা বাজিয়া গেল। সকলে যখন বিদায় হইল তখন ক্লান্তিতে অচলার শরীর ভাঙিয়া আসিতেছে, অসিতেরও প্রায় সেই অবস্থা। অসিত তাহার একখানা হাত ধরিয়া একটু চাপ দিয়া কহিল, তোমার শরীর যা হচ্ছে তা বুঝতেই পারছি, আজ আর তোমায় বিরক্ত করব না; তুমি শুয়েই পড়।

আসল কথা, মা যে এখনও ঠাকুর ঘরে পড়িয়া কাঁদিতে-ছেন একথা অসিত জানিত, তাহার তখন কিছু ভালও লাগিতেছিল না। সে অচলাকে শোয়াইয়া দিয়া, তাহার

ললাটে ছোট একটু চুম্বন করিয়া নিজেও শুইয়া পড়িল; এবং প্রায় এক মিনিটের মধ্যে ঘুমাইয়া পড়িল। অচলার সকাল-বেলাকার কথাটা জিজ্ঞাসা করিবার ইচ্ছা থাকিলেও অবসর পাইল না।

কিন্তু অত রাত্রে শুইলেও ভোরবেলা সকলের আগেই অচলার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। ঘরের মধ্যে যেন অসহ্য গরম, বোধ হয় ঘুম ভাঙ্গিবার তাহাও একটা কারণ। অসিতের দিকে চাহিয়া দেখিল সে অগাধে ঘুমাইতেছে, সে সময় তাহার ঘুমের ব্যাঘাত করা উচিত হইবে না ভাবিয়া আঁচল দিয়া তাহার কপাল ও গলার ঘাম মুছিয়া লইয়া, মাথার নীচে বালিসটা ঠিক করিয়া দিয়া বিছানা হইতে নামিয়া বাহিরে আসিল।

বাহিরের সমস্ত উঠান ও রক্‌গুলি আগের দিনের উৎসবের আবর্জ্জনায় ভরিয়া রহিয়াছে, কোথাও যেন পা বাড়াইবার জায়গা নাই। অচলা অবসন্ন ভাবে চারিদিকে চাহিল, একটুখানি বসিবার জায়গা যে তাহার চাই-ই। সহসা তাহার নজর পড়িল রান্নাঘরের দাওয়ার দিকে...একেবারে পরিষ্কার ঝর ঝর করিতেছে, বোধ হয় গত রাত্রেই কেহ সাফ করিয়া রাখিয়াছে। সে উঠান পার হইয়া রান্নাঘরের দাওয়ায় একটা খুঁটিতে ঠেস্‌ দিয়া বসিয়া পড়িল। ঠাণ্ডা ঝির-ঝিরে পূবে হাওয়ায় তাহার দেহের সমস্ত ক্লান্তি যেন মুছিয়া গেল...জননীর স্নেহ-হস্তের মত তাহার পরশ, তেমনিই শীতল, সান্ত্বনাময়!

একটু পরেই অসিতের মা ঠাকুর-ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন।

—এরই মধ্যে উঠে পড়েছ বৌমা ? কিন্তু অমন মাটির ওপর ব'সে কেন মা, একটা পিঁড়ে নিয়েও বসতে হয়ত !

তাহার পরেই তাঁহার মুখে সুগভীর বিস্ময় ফুটিয়া উঠিল, ওখানকার দাওয়াটা কে পরিষ্কার করলে মা ?…

অচলা মৃদুস্বরে কহিল, জানিনা-ত !

তাহার শাশুড়ী আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, এত ভোরে ঝি এসেছে ?…কিন্তু তাহ'লে সে গেলই বা কোথায় ?

অচলা জবাব দিল না। অসিতের মা চারিদিকে ঘুরিয়া আসিয়া শুধু কহিলেন, তাইত !

তাহার-পর যেন কতকটা অকারণেই কহিলেন, তুমি যেখানটা ব'সে আছ মা খোকা আমার ঠিক ঐ-খানেই পা পিছলে—

কথাটা শেষ করিবার আগেই কান্নায় তাঁহার গলা বুজিয়া আসিল ; তিনি চোখ মুছিতে-মুছিতে ঘাটের দিকে চলিয়া গেলেন। অচলা কেমন যেন শিহরিয়া উঠিয়া একটু সরিয়া বসিল। তাহার পরই নিজের আচরণে তাহার হাসি পাইল ; কী ছেলেমানুষই হইতেছে সে দিন-দিন !

সমস্ত দিনটা কাটিল খাওয়া-দাওয়া, মাজা-ঘষা, ধোওয়া-মোছায়। সব কাজ সারিয়া সকলে যখন বিশ্রাম করিতে গেলেন তখন সন্ধ্যার আর বেশী দেরী নাই। অচলা কিন্তু ইঁহাদের অনেক আগেই শুইয়াছিল, কাজেই ইঁহারা যখন শুইতে গেলেন তাহার ঘুম তখন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, সে বাহিরে আসিল।

আকাশে তখনও মেঘের বিপুল আড়ম্বর, বাহিরের বাতাস তখনও বৃষ্টিতে ভিজা; ক্ষণে-ক্ষণে দূর হইতে চাপা মেঘ-গর্জ্জন ভাসিয়া আসিতেছে; এমন সন্ধ্যায় নির্জ্জনতা একেবারেই

অসহ্য। একে-একে সব ঘরগুলি ঘুরিয়া সে অবসন্ন ভাবে সেই রান্নাঘরের দাওয়াতেই আসিয়া বসিল। অসিত পাড়ায় কাহার বাড়ীতে ঘুমাইতে গিয়াছে, একটা ছোট ননদও নাই যে তাহাকে ঠেলিয়া তুলিয়া গল্প করিবে! সে বসিয়া-বসিয়া তাহার বাপের বাড়ীর কথা, তাহার ভাই-বোনের কথা ভাবিতে লাগিল; তাহারাও হয়ত তখন তাহার কথাই ভাবিতেছে, কে জানে!

সহসা একটা গরম বাতাস যেন কোথা হইতে কাঁধে আসিয়া লাগিল। অচলা চমকিয়া ফিরিয়া চাহিল, কিন্তু কোথাও কাহারও চিহ্নমাত্র চোখে পড়ে না। অথচ পরিষ্কার যেন কাহারও উষ্ণ নিঃশ্বাসের মত, গরম বাতাসের একটা অনুভূতি তখনও তাহার দেহে লাগিয়া রহিয়াছে—

অকস্মাৎ তাহার মনে পড়িয়া গেল শাশুড়ীর কথা, 'ঠিক এইখান থেকেই খোকা আমার—'

তবে কি—?

একটা অজ্ঞাত আতঙ্ক মুহূর্ত-মধ্যে যেন তাহাকে পাষাণের মত নিশ্চল করিয়া দিল, মনে হইল যেন একটা হিম শৈত্য তাহার পা হইতে শুরু করিয়া তাহার সারা দেহ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে, সে কাঠের মত অনড় হইয়া বসিয়া রহিল, নড়িতেও পারিল না—

কিন্তু একটু পরেই আবার সেই নিঃশ্বাসের মত কি তাহার গায়ে লাগিল; এবার যেন আরও কাছে, আরও স্পষ্ট—

সে অস্ফুট একটা আর্তনাদ করিয়া উঠিয়া ছুটিয়া নিজের ঘরে গিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিল। তাহার পর বিছানার উপর মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া জীবনে প্রথম সে অজ্ঞান হইয়া পড়িল—

বাহিরে তখনও তাহার শাশুড়ী দ্বারে ঘা দিতেছেন, 'বৌমা, অ বৌমা, ভয় পেয়েছ কি মা ?...অ বৌমা...'...

স্ত্রী পুরুষ সকলে জড়ো হইয়া দ্বার ভাঙ্গিয়া বিস্তর শুশ্রূষা করিয়া তবে অচলার মূর্চ্ছা ভাঙ্গাইল। অসিতের মা ক্লান্ত অবস্থায় কাহাকেও তখন কোনও প্রশ্ন করিতে দিলেন না। একটু গরম দুধ খাওয়াইয়া, সারারাত আলো জ্বালিয়া রাখিবার নির্দ্দেশ দিয়া সকলকে লইয়া তিনি বাহিরে চলিয়া গেলেন। অসিত ভাঙ্গা দুয়ার যথাসম্ভব বন্ধ করিয়া বিছানায় আসিয়া বসিয়া কহিল, 'এত ভয় কি ক'রে পেলে রাণি, কেউ কি ভয় দেখিয়েছিল ?'

অচলার তখনও মোহ যেন সম্পূর্ণ কাটে নাই, সে এক-হাতে অসিতের গলা জড়াইয়া ধরিয়া বুকে মুখ গুঁজিয়া চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর সেই অবস্থাতেই ক্রমে ঘুমাইয়া পড়িল।

পরের দিন সকালবেলা শাশুড়ী আসিয়া মাথার কাছে বসিয়া বলিলেন, 'কী হয়েছিল বৌমা, এইবার আমার কাছে বলো দেখি—'

অচলা একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, 'কেমন যেন মনে হোল মা, কে যেন আমার পাশে এসে বসল; এমন কি তার নিঃশ্বাস যেন এসে গায়ে লাগল; অথচ কাউকে দেখতে পেলুম না।'

—'কোথায় বসেছিলে মা ?'

—'ঐ দাওয়ায়।'

খানিকটা চুপ করিয়া থাকিয়া অসিতের মা কহিলেন,

'আমার বিমল বড় ভাল ছেলে ছিল মা, সে-ত কারুর অনিষ্ট করবে না !...যাই হোক বৌমা, আমার মিনতি রইল, তুমি কথাটা কাউকে ব'লো না—অসিতকেও না।'

অচলা ঘাড় নাড়িয়া তাহার সম্মতি জানাইল। তারপর উঠিয়া স্নান করিতে গেল।

সেদিন বাড়ীতে লোকজনও কম, কাজও কম। স্নান সারিয়া কিছুক্ষণ শাশুড়ীর পূজার ঘরের কাজে সাহায্য করিয়া তাঁহারই ঘরে আসিয়া বসিল। ঘুরিয়া ফিরিয়া তাহার সকাল বেলাকার কথাটা মনে আসিতেছিল...তবে তাহার ভাসুরই ? কিন্তু এও কি সম্ভব ?...না সমস্তটাই তাহার কল্পনা !......

অন্যমনস্ক হইবার জন্য সে পাশের তাক হইতে একখানা বই পাড়িয়া লইল। বইটা রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি'...এবং এমনিই অদৃষ্টের পরিহাস, মলাটের উপর তাহার ভাসুরেরই নাম লেখা রহিয়াছে !

পাতা উল্টাইতে-উল্টাইতে এক টুক্‌রা কাগজ বই হইতে বাহির হইয়া তাহার কোলের উপর আসিয়া পড়িল। কৌতূহলী হইয়া কাগজটা লইয়া দেখিল যে তাহাতে কবিতা লেখা রহিয়াছে; পড়িতে পড়িতে তাহার মুখ-চোখ লাল হইয়া উঠিল। প্রেমের কবিতা—এবং তাহার উপর পরিষ্কার লেখা রহিয়াছে, আমার ভাবী-বধূ অচলার উদ্দেশে—

সবটা বার-দুই পড়িয়া কাগজখানা টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল, তারপর টুক্‌রাগুলি হাতের মধ্যে মুঠা করিয়া ধরিয়া অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।...কে

জানে কোন বর্ষামুখর রাত্রে কিম্বা কোন্ ফাল্গুন-সন্ধ্যায় তাহাকেই উপলক্ষ্য করিয়া এ কবিতা লেখা হইয়াছিল, সে-দিনের বেদনা, সেদিনের সেই কল্পনা আজ তাহার বুকের মধ্যে যেন একান্ত ভাবে সে অনুভব করিল। সেদিনের কল্পনা যাহার জীবনে আর কখনও মূর্ত্তি লইল না, তাহারই বেদনা অচলার বুকে অনেকখানি ব্যথা জাগাইয়া তুলিল। ভাবিতে-ভাবিতে তাহার চক্ষু সজল হইয়া আসিল, সে মাথা নাড়িয়া কহিল, 'না, না, আসুন তিনি আমার কাছে, আর আমি ভয় পাব না।'

কোথা হইতে অসময়ে একটা দমকা বাতাস আসিয়া বাহিরের কামিনী গাছটাকে বিপর্যস্ত করিয়া তুলিল, সে বাতাসের রেশ ঘরের মধ্যেও আসিয়া পেঁাছিল। কিন্তু অচলার মন প্রকৃতির এই আনন্দ-চঞ্চলতায় যোগ দিতে পারিল না। মুঠার মধ্যে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন কবিতা-লেখা কাগজখানি লইয়া সে তেমনিই স্থির হইয়া বসিয়া রহিল।

প্রথম অভিনয় রজনী

পাঁচী ওরফে পাঁচুবালার নূতন পরিচয়ের আবশ্যকতা নাই। যাঁহারা বছর বারো আগেকার রঙ্গমঞ্চের সহিত পরিচিত ছিলেন, তাঁহারাই জানেন, সে সময় রঙ্গমঞ্চে পাঁচুবালা অপেক্ষা অধিকতর খ্যাতিলাভ অন্য কোনও অভিনেত্রীর অদৃষ্টে ঘটিয়া ওঠে নাই।

তাহার চেহারা এমন কিছু অসাধারণ ছিল না—বাংলা দেশের রঙ্গমঞ্চে কাহারও অসাধারণ চেহারা নাই—কিন্তু যে কোনও ভূমিকাতেই তাহাকে মানাইত। তাহা ছাড়া নৃত্যে, গীতে, অভিনয়ে, রঙ্গে, ভাবে, ভঙ্গীতে সে ছিল অসামান্যা।

পয়সা আসিয়াছিল তাহার ঘরে সাধিয়া। মোটা মোটা টাকা, মাহিনা ও বোনাসের রূপ ধরিয়া তাহার সিন্দুকে আসিয়া ঢুকিত। খ্যাতির ত কথাই নাই, বড় বড় দেশসেবক, সাহিত্য-সম্রাটের দল তাহার সহিত যাচিয়া আলাপ করিতে যাইতেন। এক কথায় দিন তাহার ভালই কাটিতেছিল, কিন্তু কাল হইল তাহার পরেশ মুখুজ্জেকে ভালবাসা !

পরেশ থিয়েটারে ঢুকিয়াছিল অভিনেতা হিসাবে। তাহার চেহারা ছিল ভালই, কণ্ঠস্বরও মিষ্ট।…সে সোজাপথে চলিলে অর্থ ও যশ উভয়ই পাইতে পারিত কিন্তু অত পরিশ্রম করা তাহার স্বভাবে খাপ খাইল না। সে খুব সহজ একটা উপার্জ্জনের পথ খুঁজিতে লাগিল এবং সহজেই পাইল !

পাঁচুবালার মন ছিল কোমল, তাহাকে ভালবাসা জানানো এমন কিছু কঠিন কথা নয়। দুই-চারিটি চিঠি, দিনকতক

রুক্ষ স্নান এবং কয়েকটি দীর্ঘশ্বাসে পাঁচী গলিয়া গেল; ধাপার কুমার-বাহাদুরকে অপমান করিয়া তাড়াইল এবং পরেশকে লইয়া এত বাড়াবাড়ি শুরু করিল যে প্রবীণারা সকলে একমত হইয়া ঘোষণা করিলেন, পাঁচীর অধঃপতনের আর দেরি নাই। কুমার-বাহাদুরের সহিত মাসিক তিন শ' টাকা ও গহনা ত গেলই, উপরন্তু পরেশের যাবতীয় খরচা প্রতিমাসে সিন্দুক হইতে যাইতে শুরু করিল। তা ছাড়া এত বাড়াবাড়ি করিলে কি চাকরী থাকিবে ?

পাঁচীর চাকুরী রহিল বটে কিন্তু পরেশের গেল। পরেশ ইহাতে এত অপমান বোধ করিল যে নিজে থিয়েটার না করিতে পারিলে আর জলগ্রহণ করিবে না প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিল। অগত্যা পাঁচীকেই বিশ হাজার টাকা ঘর হইতে বাহির করিতে হইল এবং নিজের চাকুরীতে ইস্তফা দিতে হইল। শুধু তাই নয়, একটা মাত্র অভিনেত্রী লইয়া ত আর থিয়েটার চলে না, তাই তাহাকেই আবার গুটি কতক মাঝারী দলের অভিনেতা ও অভিনেত্রী খুঁজিয়া যোগাড় করিতে হইল !

তারপর শিক্ষা দেওয়া, নাচ দেওয়া, তদারক করা—সমস্ত-কাজের ভারও তাহারই উপর। যাহা হউক—প্রাণপণ পরি-শ্রমে থিয়েটার খোলাও হইল—এবং বইটি পাঁচীর জন্য জমিয়াও গেল। কিন্তু পাঁচীর অশান্তি বাড়িল বই কমিল না। এত কষ্টের টাকা তাহার কাছে একটিও গেল না; দেনাত শোধ হইলই না। পরেশের অনেকগুলি নূতন উপসর্গে সমস্ত টাকা হু-হু করিয়া উড়িয়া যাইতে লাগিল। তার মধ্যে মদ ও রেস প্রধান। এততেও দুঃখ ছিল না, যদি

—যে ভালবাসার জন্য পাঁচী সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিল, সে ভাল-বাসাটুকু তাহার অদৃষ্টে টিঁকিয়া থাকিত।

নূতন একটি মেয়ে সখীর দলে যোগ দিয়াছিল, তাহার নাম কালো। ছিপ্‌ছিপে চেহারা, মুখখানি সুন্দর। দেখিলে মনে হয় বয়স কম, বুদ্ধিও সেই অনুপাতে কাঁচা, কিন্তু বয়স যাহা হউক বুদ্ধি যে তাহার কাহারও অপেক্ষা কম নয় তাহা শীঘ্রই বোঝা গেল।

সে আসিয়া অবধি পাঁচীকে ডিঙ্গাইয়া পরেশের দিকে মনোযোগ দিল এবং সে মনোযোগের ফল ফলিতেও দেরি হইল না। পরেশ মধ্যে মধ্যে রাত্রে বাড়ীফেরা বন্ধ করিল, প্রকাশ্যেই কালোর সহিত নানা প্রকার হাসিতামাসা আরম্ভ করিল এবং সর্বোপরি, নূতন বইয়ে জোর করিয়া একটা বড় ভূমিকা কালোকে দিল। দেখিতে দেখিতে নানা প্রকার কানা-ঘুষা চলিতে শুরু হইল এবং শীঘ্রই কালোর একটি বড় রকমের মোসাহেবের দল জুটিয়া গেল।…

পুরাতন থিয়েটার হইতে যে কয়টি মেয়ে পাঁচীর সহিত ছাড়িয়া আসিয়াছিল তাহার মধ্যে নীলিমা ছিল সব চেয়ে পাঁচীর প্রিয়পাত্রী। নীলির চেহারা ছিল পাঁচীর মতই অনেকটা—অভিনয়ও খুব মন্দ করিত না! কিন্তু বড় অভি-নেত্রীদের অনুপস্থিতিতে তাহাদের ভূমিকা অভিনয় করিয়াই তাহার এতদিন কাটিয়াছিল। তাহার কারণ সে কিছুতেই নূতন ভূমিকা লইতে চাহিত না—জোর করিয়া দিয়াও সুফল পাওয়া যায় নাই। পাঁচী তিরস্কার করিত, 'এম্‌নি করেই কি চিরকাল কাটাবি? খেটেও মরিস্‌, অথচ নামও নেই, পয়সাও নেই। এইটুকু সাহস নেই তোর?'

কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় নাই।

এবারে নূতন বইয়ে ঐ ভূমিকাটি সে জোর করিয়া নীলিমাকে দিবে মনে করিয়াছিল। তাই খবরটা যখন সে নীলিমার মুখে পাইল তখন একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল। অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, 'ও পার্টটা তোকে দেব বলে ঠিক ক'রে রেখেছি যে!'

নীলি তাড়াতাড়ি কহিল, 'থাক্‌গে দিদি, তার চেয়ে এ ভালই হ'লো, হয় ত আমি পারতুম না।'

পাঁচী কহিল, 'না নীলি, মুখুজ্জে আসুক, এর একটা হেস্তনেস্ত আমি করবই। যা করে করুক কিন্তু বই নিয়ে আমি ছেলেখেলা করতে দেব না। তা ছাড়া আমি সবাইকে বলে রেখেছি এ পার্ট তোকে দোব—এখন আমি তাদের কাছে মুখ দেখাবো কি করে? আর ঐ কালো?—যে এখনও ষ্টেজে দাঁড়াতে শিখলে না?'

নীলি আরও একবার বুঝাইবার চেষ্টা করিল, 'কেন এ সামান্য বিষয় নিয়ে মাথা গরম করছ দিদি, আমি না হয় বল্‌ব যে আমি কিছুতেই ভরসা করলুম না বলেই---'

পাঁচী কহিল, 'না নীলি, তা হয় না।'

কিন্তু বাধা দিতেও পাঁচী পারিল না। পরেশ সেদিন থিয়েটারে আসিল কালোকে সঙ্গে করিয়া; আসিয়াই নিজের ঘরে গিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিল; চাকরের মারফৎ বলিয়া পাঠাইল, কালোকে সে নিজেই শিক্ষা দিবে, বাকী পার্টগুলি যেন পাঁচী ঠিক করিয়া দেয়।

পাঁচী চাকরকে বলিল, 'বাবুকে গিয়ে বল্‌ যে রিহার্শ্যালের সময় সবাইকে থাকতে হবে, নইলে রিহার্শ্যাল আমি দেব না।'

কিন্তু চাকর আর তাহার জবাব লইয়া ফিরিল না, সোডা কিনিতে বাজার চলিয়া গেল। প্রায় আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করিয়াও যখন কালোর চিহ্নমাত্র দেখা গেল না, তখন সে নীলিকে সঙ্গে করিয়া বাড়ী ফিরিয়া গেল। পথে কেহ কাহারও সহিত একটি কথাও কহিল না---বাড়ীতে পেঁাছিয়াও পাঁচী নিঃশব্দে নিজের ঘরে চলিয়া গেল।

নীলি পাঁচীর বাড়ীতেই ভাড়া থাকিত, সকালে উঠিয়া সে পাঁচীর মুখের দিকে চাহিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল, 'দিদি, কাল রাত্তিরে ঘুমোও নি ?'

পাঁচী শুধু সংক্ষেপে কহিল, 'না।' তারপর পায়ের নখ খুঁটিতে খুঁটিতে কহিল, 'কাল তোদের ঘরের সামনে দিয়ে কলঘরে যেতে যেতে কানে গেল প্রফুল্ল কি 'কালো' 'কালো' বলে বল্‌ছিল; কি বলছিল রে ?'

প্রফুল্ল নীলির বাবু—মস্ত বড়লোকের ছেলে। তাহার মিষ্ট স্বভাবের জন্য পাঁচী তাহাকে বড় ভালবাসিত।

নীলি কহিল, 'কৈ বিশেষ কি বল্‌ছিল ? আমার মনে নেই ত!'

পাঁচী নীলির হাত ধরিয়া কহিল, 'আমার মাথা খাস্ নীলি, সত্যি করে বল্ কি বলছিল।'

নীলি নতমুখে কহিল, 'কাল উনি দু'তিনজন বন্ধুবান্ধব নিয়ে চাঙ্গুয়ায় গিয়েছিলেন খেতে, সেখানে মুখুজ্জে মশাই-এর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। কালোও সঙ্গে ছিল।'

পাঁচী নীলির হাত ছাড়িয়া দিয়া শুধু কহিল, 'হুঁ।'

নীলি আস্তে আস্তে প্রশ্ন করিল, 'কাল রাত্তিরে মুখুজ্জে-মশাই আসে নি ?'

---'না।'

সেদিনও যথা-সময়ে পাঁচী রিহার্শ্যালে গেল। কিন্তু ষ্টেজে ঢুকিবার আগেই কানে গেল, কালো কাহাকে বলিতেছে, 'গিন্নী কাল ঝাল ক'রে চলে গেলেন বুঝি ? রিহার্শ্যাল না দিয়েই ? তা আমি কি কর'ব বলো, যার থিয়েটার সে যা হুকুম করবে তাই হ'বে ত !'

যে শুনিতেছিল সে জবাব দিল, 'তা বটেই ত বোন্—তুমি আর কি করবে ?'

কালো উৎসাহ পাইয়া গলা আর এক পর্দ্দা চড়াইয়া দিল, 'রিহার্শ্যাল না দিয়ে চলে গেছে শুনে উনি কত রাগ করতে লাগলেন, 'এতে আমার থিয়েটারের কত ক্ষতি হয়, এ রকম করলে ওকে রাখা চল্‌বে না'—উল্টে আমি আবার কত বোঝাই---'

পাঁচী ধীরে ধীরে বাহির হইয়া আসিল। নীলিও আসিতেছিল, পাঁচী কহিল, 'তুই থাক্---'

গাড়োয়ান আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, 'আপ্ আভি চলা যায়েঙ্গে মাঈজী ?'

---'হ্যাঁ বাবা, শরীরটা বড় খারাপ করেছে।'

কিন্তু নীলি ছাড়িল না, সে জোর করিয়া গাড়ীতে আসিয়া চাপিল। কহিল, 'আজ তোমায় একলা ছেড়ে দিতে পারব না দিদি, তুমি যতই বলো।'

পাঁচী কহিল, 'জানে যে আমি ঘেন্নায় নালিশ পর্য্যন্ত করতে পারব না, তাই এতবড় শয়তানী আমার সঙ্গে করতে পারলে !'

নীলি জানিত এ ব্যথা কত গভীর, সে বৃথা সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিল না।

পরের দিন পাঁচী নীলিকে জোর করিয়া থিয়েটারে পাঠাইয়া দিল, কহিল, 'আমি আর যাব না নীলি, কিন্তু তুই যা। তোর অনেক উন্নতি হ'বে আমি বলে দিলুম; শুধু যদি একটু সাহস করিস—'

নীলি চোখের জল মুছিতে মুছিতে গাড়ীতে গিয়া উঠিল।

থিয়েটারে গিয়ে প্রথমেই দেখা হইল পরেশের সঙ্গে। পরেশ কহিল, 'তুই একলা যে নীলি ?'

—'দিদি আর আসবে না !'

পরেশের মুখ অন্ধকার হইল—কিন্তু কালো পাশেই দাঁড়াইয়াছিল, সে ফোড়ন কাটিল, 'আস্‌বে না ত নোটিশ দেওয়া উচিত ছিল !'

নীলি স্বভাবতঃ ভালমানুষ কিন্তু সে আর সহ্য করিতে পারিল না, কহিল, 'মুখ সাম্‌লে কথা ব'লো কালো। তুমি ছেলেমানুষ, সেদিন এসেছো—তুমি না জানতে পারো কিন্তু আমরা জানি যে সে বিশহাজার টাকা ঘর থেকে এই থিয়েটারের জন্য বার করে দিয়েছে, তার মধ্যে একটি পয়সাও তার সিন্দুকে ফিরে যায়নি।—নোটিশ দেবে কাকে সে ? সে কি কারুর চাকরী করত ? চোখ রাঙ্গাবার চেষ্টা ক'রো না মুখুজ্জে মশাই, সাড়ে তিন মাসের মাইনে আমার পাওনা, চোখ রাঙাচ্ছ কাকে ?'

কালো ক্রোধে অগ্নিবর্ণ হইয়া পরেশের দিকে চাহিল কিন্তু পরেশ তখন ধীরে ধীরে সেখান হইতে সরিয়া যাইতেছে।

ইহার পর পাঁচীর পার্ট আর একজনকে দিয়া কোনও রকমে চালানো হইল কিন্তু দর্শক-সমাগম একেবারেই কমিতে

শুরু করিল। মাসখানেক পরেই আবার নূতন নাটক মহল্লায় পড়িল, এবার কালোরই প্রধান ভূমিকা থাকিবে এইরূপ স্থির হইল।…

পাঁচীর একটা বিশ্রী কাশি দেখা দিয়াছিল, নীলরতনবাবু বলিয়া গেলেন, 'কিছুদিন ভাওয়ালী কিম্বা নৈনীতাল গিয়ে থাকলে ভাল হয়।'

পাঁচী চিঠি লিখিয়া ভাওয়ালীতে ঘর ঠিক করিল। তারপর একদিন নীলির বাবু প্রফুল্লকে ডাকিয়া কহিল, 'আমায় একটা ভাল এটর্ণি দেখে দিতে পার ভাই ?'

প্রফুল্ল কহিল, 'কি করবে ?'

পাঁচী কহিল, 'বাড়ী-ঘর-দোর টাকাকড়ির একটা ব্যবস্থা করে যেতে চাই, বলা ত যায় না !'

নীলি কহিল, 'কী সব অলুক্ষুণে কথা বলো দিদি !'

পাঁচী কথা না কহিয়া শুধু নীলির গাল দুটি টিপিয়া দিল।

ইহার দিন-দুই পরেই একদিন দ্বিপ্রহরে নীলিকে ঘরে ডাকিয়া একটা মোটা লেফাফা হাতে দিয়া কহিল, 'যত্ন করে তুলে রাখিস নীলি, এটা আমার উইল।'

নীলি অবাক হইয়া কহিল, 'আমার কাছে কেন দিদি ?'

পাঁচী সোজা জবাব না দিয়া কহিল, আমি হাজার-দুই টাকা হাতে নিয়ে যাচ্ছি, এছাড়া ব্যাঙ্কে আমার হাজার আষ্টেক টাকার কাগজ রইল, প্রায় হাজার-তিনেক টাকার গহনাও আছে। এই বাড়ী, মায় আসবাবপত্র আর টাকাকড়ি সব আমার অবর্ত্তমানে তোর। এই সিন্দুকের চাবিটা রেখে দে —যদি আসি ত, তোর কাছে এসে থাকব কিন্তু এসব কচু-

কচির মধ্যে আর যেতে চাইনা।'

নীলি আকুল হইয়া কহিল, 'কেন—আমায় এমন করে ঋণী কর্‌ছ দিদি ?'

পাঁচী আঁচল দিয়া উহার চোখ মুছাইয়া দিয়া কহিল, 'দূর পাগ্‌লী, আমার ঋণই তোর কাছে কি কম ?...আশীর্ব্বাদ করি, তোর একটু ভরসা হোক্‌—বড় পার্টে নাম্‌ ভরসা ক'রে —তুই অনেক বড় হ'বি নীলি, এ আমি বলে দিলুম।'

এধারে বড়ই গোলযোগ। মাতাল হইয়া পরেশ কালোর বাড়ীতে পড়িয়া থাকে—রিহার্শ্যাল হয় না। বুড়া ষ্টেজ-ম্যানেজার বঙ্কিমবাবু কোনও রকমে দুইখানা তিনখানা পুরাতন বই দিয়া থিয়েটার চালান। তাহাতেও কোনও দিন সাতাশ টাকা, কোনও দিন চল্লিশ টাকা—যেদিন খুব বেশী বিক্রী হয় সেদিন নব্বুই টাকা। কেহ মাহিনা পত্র পায় না —ইলেক্ট্রীকের বিল দেওয়া মুস্কিল এমনতর ব্যাপার। এমন সময় শোনা গেল, পরেশ এক বড় লোকের ছেলেকে পাক্‌ড়াইয়াছে—নূতন বই'এর জন্য অজস্র অর্থব্যয় করা হইবে।

নীলি থিয়েটার হইতে ঘুরিয়া আসিয়া সেই কথাই প্রফুল্লর কাছে গল্প করিতেছিল। প্রফুল্ল কহিল, 'নতুন বইটা কেমন মনে হয় তোমার ?'

নীলি কহিল, 'ছাই। মাথাও নেই, মুণ্ডুও নেই। বইখানা মুখুজ্জে নিজে যেমন তেমন করে লিখেছে। আর জম্‌বেই বা কিসের জোরে, যেমন অপেরা মাষ্টার তেমনি রিহার্শ্যাল মাষ্টার, তেমনি নাচিয়ে আর তেমনি ষ্টাফ—কার পালক উঠেছে, কতকগুলো টাকা নষ্ট করছে।'

সহসা প্রফুল্লর মুখ শুকাইয়া উঠিল। কহিল, 'তাই নাকি ? তবে যে মুখুজ্জে বললে—'

সহসাই আবার থামিয়া গেল। কিন্তু নীলি সন্দিগ্ধ হইয়া কহিল, 'মুখুজ্জে কি বল্‌লে ? কবে তার সঙ্গে দেখা হ'লো, কৈ তুমি বলোনি ত কিছু ?'

প্রফুল্ল ঢোঁক গিলিয়া কহিল, 'না এমন কিছু নয়। কাল দেখা হ'লো মুখুজ্জে'র সঙ্গে, সে বললে যে এ বইটা জম্‌তে বাধ্য।'

নীলি তবুও তীক্ষ্নদৃষ্টিতে প্রফুল্লর মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, 'তুমি অমন ক'রে কথা বলছ কেন ? তুমি দাওনি ত টাকাকড়ি কিছু ?'

প্রফুল্ল হাসিয়া কহিল, 'পাগল !'

রিহার্শ্যাল এধারে এক প্রকার হইলেও যাহার সবচেয়ে বড় পার্ট সে বোধ হয় গোনা দুই-তিন দিন মাত্র রিহার্শ্যালে আসিয়াছিল, তাহাও অতি অল্প সময়ের জন্য। কিন্তু ইতি-মধ্যে বঙ্কিমবাবুর হাতে অনেক টাকা আসিয়া পড়িয়াছিল, তিনিই বস্তুতঃ ম্যানেজারের কাজ করিতেছিলেন; মাহিনা-পত্র যাহার যাহা পাওনা ছিল সব পাই পয়সা মিটিয়া গিয়াছে, অন্যান্য পাওনাদারেরাও কিছু কিছু পাওনা কমাইয়া নগদ রফা করিয়া গিয়াছে, অর্থাৎ টাকা যে কোনখান হইতে প্রচুর আসিয়াছে তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।

অভিনয়ের দিন সকালেও রিহার্শ্যাল ডাকা হইয়াছে। সেদিন মুখুজ্জের সহিত প্রফুল্ল কোথা হইতে রিহার্শ্যাল দেখিতে আসিয়াছিল, সে নীচে ড্রেস-সার্কেলে একটা সীটে গিয়া বসিল। কে জানে কেন নীলিমার মনে একটা দুর্ভাবনা

দেখা দিয়াছিল, কিন্তু সে প্রফুল্লর সহিত কথা কওয়ার সুযোগ পাইল না।

কালো প্রায় বেলা আটটার সময় পানের ডিবা হাতে করিয়া দেখা দিল, কহিল, 'বঙ্কিম বাবু, আজ রাত্রে বই খোলা হবে না। একটা প্লাকার্ড দিয়ে দিন, আসছে সপ্তাহে বই খোলা হ'বে।'

সকলে পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল। বঙ্কিমবাবু কহিলেন, 'কেন ?'

—'আমার বোনের আজ সকাল থেকে ব্যথা উঠেছে, আমায় না দেখতে পেয়ে অস্থির হয়ে উঠ্‌ছে—আজ আমি নাম্‌তে পারব না।'

বঙ্কিমবাবু কহিলেন, 'একজন নামতে না পারলে প্লে বন্ধ হবে, সে রকম এক্‌ট্রেস তুমি নও। সে বটে ছিল পাঁচী!··· যাক, এ প্লে ফেলিওর হবেই, তুমি না নামলে বরং হয়ত একটু ভাল হওয়ার আশা থাকে। তোমার ইচ্ছে হয় তুমি নাবো, না ইচ্ছে হয় পথ দেখ—'

কালো লাল হইয়া উঠিয়াছিল, কহিল, 'এত বড় কথা আমায় বলেন, এত আস্পর্দ্ধা আপনার ? জানেন আমি এখনি আপনাকে জবাব দিতে পারি ?'

বঙ্কিমবাবু কহিলেন, 'না তা তুমি পারো না, যে জবাব আমায় দিতে পারে সে ঐ নীচে বসে আছে। তোমার গুণধর বাবু এখন আর মালিক নন।'

বঙ্কিমবাবু আঙ্গুল দিয়া প্রফুল্লকে দেখাইয়া দিলেন। সম্মুখে বজ্রপাত হইলেও সকলে এত স্তম্ভিত হইত কিনা সন্দেহ। নীলির মুখ সাদা হইয়া গিয়াছিল—আর কালোও।

সে হতভম্ব ভাবে কহিল, 'তার মানে ?'

বঙ্কিমবাবু কহিলেন, 'তার মানে জিজ্ঞাসা করনা তোমার বাবুকে।'

পরেশ তখন পা-পা করিয়া ষ্টেজ হইতে বাহির হইয়া যাইতেছিল ; কালো কহিল, 'পালাচ্ছ যে বড়, এর মানে কি আমায় বুঝিয়ে দাও।'

পরেশ মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে কহিল, 'থিয়েটার লিজ-সুদ্ধ আমি বেচে দিয়েছি,---প্রফুল্ল বাবুকে।'

কালো কহিল, 'আমায় না জানিয়ে এত বড় কাজ তুমি করলে ?'

পরেশ শুষ্কস্বরে কহিল, 'কি করব, পাওনাদারদের জ্বালায় অস্থির হচ্ছিলুম—'

কালো আর কথা না কহিয়া দুম্ দুম্ করিয়া পা ফেলিয়া বাহির হইয়া গেল। পরেশও তাহার পিছু পিছু সরিয়া পড়িল।

ততক্ষণে প্রফুল্ল উপরে উঠিয়া আসিয়াছে। নীলি কাছে গিয়া কহিল, 'কেন আমায় না বলে এমন কাজ করলে তুমি ? কত টাকা দিয়েছ ?'

প্রফুল্ল মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে কহিল, 'দশহাজার টাকা ওকে দিয়েছি, আরও প্রায় পঁচিশ হাজার টাকা দেনা শোধ করতে হয়েছে।'

নীলি প্রায় কাঁদিয়া ফেলিল। কহিল, 'কেন এ কাজ করলে ? এর সবই যে জলে গেল।'

প্রফুল্ল কহিল, 'মুখুজ্জে এমন করে বোঝাল যে মনে হ'ল এ একেবারে অব্যর্থ—আর তোমার থিয়েটার হবে—হ'লে

তোমার 'দিদি'কে আনানো যাবে হয়ত, এ ইচ্ছেও ছিল।

নীলি কহিল, দিদি গত সপ্তাহেও লিখেছে, তার অসুখ বেড়েছে—

বঙ্কিমবাবু আসিয়া পড়িলেন। প্রফুল্ল কহিল, এখন কি হবে তা হ'লে? ওর পার্ট কে করবে?

বঙ্কিমবাবু কহিলেন, কেন নীলি করবে? ওর ত রিহার্স্যাল দেওয়াই আছে। কালোর চেয়ে ও ভাল করবে।

নীলির মুখ শুকাইয়া উঠিল। সে কহিল, না, না, সে কি করে হ'বে? ও পার্ট কি আমি করতে পারব?

বঙ্কিমবাবু কহিলেন, পারতে হবে। নইলে আর কেউ নেই। পার্টটা নিয়ে বাড়ী চলে যাও, ভাল করে ভাবগে। পাঁচীর অনেক প্লে তুমি দেখেছ, সে হ'লে কোন্‌খানে কি করত সেইটে মনে করার চেষ্টা করো। ভয় কি, এক রকম করে হ'য়েই যাবে।

নীলি কিন্তু বিশেষ সান্তনা পাইল না। প্রফুল্ল শুধু যখন কহিল, 'লক্ষ্মীটি, নইলে ভয়ানক বদনাম হবে'—তখনই সে পার্টটা লইয়া বাড়ীতে চলিয়া গেল।

সন্ধ্যাবেলা নীলি সাজিতে বসিয়াছে, এমন সময় প্রফুল্ল ব্যস্তভাবে আসিয়া কহিল, ওগো, তোমার নামে টেলিফোন আস্‌ছে কাশী থেকে।

নীলি কহিল, সে কি? কাশী থেকে আমায় কে টেলি-ফোন করবে?

—তা ত আমি জানি না। কিন্তু শীগ্‌গির যাও।

নীলি কহিল, আমি যে রং করছি—

১০

—তা'তে কি হয়েছে, পাশের ঘরে ফোন রয়েছে। ট্রাঙ্ক কল, ও ত আর দেরি করার যো নেই !

নীলি তাড়াতাড়ি গিয়া ফোন ধরিল। তখনই কাশী হইতে কনেক্‌শান হইল।

একটা ক্ষীণ স্বর ভাসিয়া আসিল, কে, নীলি !

অত্যন্ত ক্ষীণ হইলেও নীলি সে স্বর চিনিতে পারিল, দিদি !

—হ্যাঁ আমি, দেরাদুন থেকে বাড়ী ফিরছিলুম পথে বড্ড শরীর খারাপ হয়ে পড়ায় কাশীতে নেবে পড়তে হ'লো। এখানে হাসপাতাল থেকে অনেক টাকা দিয়ে টেলিফোন করার ব্যবস্থা করলুম। বেশী কথা এরা কইতে দিচ্ছেনা। আজ তোদের নতুন বই খোলা হবে না ?

নীলি তখন যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে সমস্ত ইতিহাস খুলিয়া বলিল। পাঁচীর কণ্ঠস্বর ঈষৎ উত্তেজিত হইয়া উঠিল।

সে কহিল, বড্ড আনন্দ হ'ল শুনে নীলি ! তুই কিছু ভাবিস্ নি, ভরসা করে নেবে পড়্; ভুলে যা তুই নীলি, মনে করার চেষ্টা কর্, তোর মধ্যে দিয়ে আমি প্লে করছি। আমি তোর সঙ্গে আছি সর্ব্বদা এই মনে করিস্—নিশ্চয় উতরে যাবে। তুই যদি ভয় পাস্ তাহ'লে সব বইটা নষ্ট হ'য়ে যাবে আর প্রফুল্লর অতগুলো টাকা মারা যাবে ! আমি আশীর্ব্বাদ করছি বোন্, আজ তোর জয়-জয়কার নিশ্চয়—

সহসা ফোন কাটিয়া গেল। নীলি প্রফুল্লকে কহিল—এমন হঠাৎ বন্ধ হ'ল কেন বলো দেখি ?

—সময় হয়ে গেছে বলে বোধ হয় কোম্পানীর লোকেরা কেটে দিলে।

নীলি আবার সাজিতে চলিয়া গেল।

লোক সেদিন খুব বেশী হয় নাই, তবুও নিমন্ত্রিত লোকজন লইয়া প্রায় অর্দ্ধেক সীট ভরিয়া গিয়াছিল। পরেশও একখানা সীট কাটাইয়া আসিয়া বসিয়াছিল, বোধ করি মজা দেখিতে আসিয়াছিল। প্রফুল্লর সহিত চোখো-চোখি হইল বটে, কিন্তু প্রফুল্ল ঘৃণায় কথা কহিল না। এত অপদার্থ, পাজী, নির্লজ্জ মানুষ হয় ?

যথাসময়ে ড্রপ উঠিল। প্রথম সিনে নীলির কোনও পার্ট ছিল না, কিন্তু দ্বিতীয় সিনে প্রথম হইতেই তাহার কথা ও গান। কিন্তু এ কি ? সমস্ত প্রেক্ষাগৃহ হইতে একটা মৃদু গুঞ্জন উঠিল, প্রফুল্ল চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতে যাইতেছিল, পিছনের লোক জামা ধরিয়া বসাইয়া দিল। আর সব চাইতে বিস্মিত হইয়াছিল পরেশ, তাহার মুখ একেবারে সাদা হইয়া গিয়াছিল।

এ যে পাঁচী !—সেই হাসি, সেই চাহনী, সেই গান, সেই চেহারা, সেই অঙ্গভঙ্গী আর সর্ব্বোপরি সেই সুন্দর অনবদ্য অভিনয়। দর্শকেরা বার বার প্রোগ্রাম দেখিতে লাগিল; ঐ ত শ্রীমতী বিনোদিনী (কালো)'র নাম কাটিয়া পরিষ্কার লেখা রহিয়াছে শ্রীমতী নীলিমা ! তবে এ কি ?

দৃশ্যের পর দৃশ্যে দর্শকদের করতালি ও উল্লাস ধ্বনিতে প্রেক্ষাগৃহ মুখরিত হইয়া উঠিল। অবশেষে প্রথম অঙ্কের যবনিকা পড়িতেই প্রফুল্ল ছুটিল সাজঘরের দিকে—সঙ্গে সঙ্গে পরেশও ! পরেশ প্রফুল্লকে দেখিয়া কহিল, পাঁ-পাঁচী এল কোথা থেকে ! নীলির নামবার কথা ত ! এ-এসব কি ?

প্রফুল্ল কোনও জবাব না দিয়া ভিতরে চলিয়া গেল। নীলিকে ঘিরিয়া তখন যথেষ্ট ভীড়—বৃদ্ধ বঙ্কিমবাবু চশমার ফাঁক দিয়া চোখ মুছিতেছিলেন, কি প্লে-ই করলি মা, আজ অনেকদিন পরে পাঁচীর দুঃখ ভুলিয়ে দিলি। ঠিক মনে হচ্ছে সে-ই বুঝি হঠাৎ কোথা থেকে এসেছে।

নীলি প্রফুল্লকে দেখিতে পাইয়া ছুটিয়া আসিয়া কহিল, কেমন হ'লো, বলনা গো।

প্রফুল্ল কহিল, দাঁড়াও, ব্যাপারটা আমায় বুঝতে দাও—তাহ'লে তুমিই ?

নীলি হাসিয়া কহিল, তুমি কি মনে করছিলে দিদি ?··· তা দিদি বলেছে বটে যে, আজ সে আমার সঙ্গে মনে মনে জড়িয়ে থাক্‌বে—

দ্বিতীয় অঙ্ক, তৃতীয় অঙ্ক—এমনি করিয়া শেষ যবনিকা পর্য্যন্ত দর্শকদের উল্লাসধ্বনি বারবার নীলিকে অভিনন্দিত করিল। বোঝা গেল এ অভিনয় জমিবে এবং প্রফুল্লর টাকা ঠিক জলে যাইবে না।

নীলি আর প্রফুল্ল, প্রফুল্লর মোটরে করিয়া বাড়ী ফিরিল। পথে নীলি কহিল, কিন্তু মনটা আমার ভাল লাগ্‌ছেনা—দিদির অসুখ বাড়ল কেন কে জানে! সে এখানে আর কিছু দিন আগে এল না কেন বাপু!

তারপর সহসা কহিল, আজ শনিবার—পরশু আমায় কাশীতে নিয়ে যাবে ? দিদিকে দেখে অমনি সঙ্গে করে নিয়ে আস্‌ব—শনিবারের আগেই ফিরে আস্‌ব এখন।

প্রফুল্ল তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, তাই হবে গো,

তাই হবে !…কিন্তু বলি, এত গুণ এত দিন লুকিয়ে রেখেছিলে কেন ?

নীলি কহিল, দিদির আশীর্ব্বাদ ছিল—নিশ্চয় উতরে যাবে।…

পরের দিন সকালেই প্রফুল্ল চাকরকে বাহিরে পাঠাইল, দৈনিক কাগজগুলির জন্য। কাগজ যখন আসিয়া পেঁাছিল তখন নীলি স্নান করিতে যাইতেছে; কহিল, কি লিখেছে গো কাগজে ?

প্রফুল্ল কাগজেই মুখটা ঢাকিয়া জবাব দিল, নেয়ে এসো, জলটল খাও আগে, তারপর সব পড়ে শোনাব।

কারণ কাগজ খুলিতেই তাহার নজরে পড়িয়াছিল—

অভিনেত্রীর শোচনীয় মৃত্যু

কাল সন্ধ্যায় যখন দ্বিতীয় পাঁচুবালা (শ্রীমতী নীলিমা) দর্শকদের সম্মুখে নূতন বিস্ময়ের ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করিতেছিলেন, ঠিক সেই সময়েই ৺কাশীধামে আসল পাঁচুবালার মৃত্যু ঘটিয়াছে ! কিছুদিন হইতে তিনি যক্ষ্মারোগে ভুগিতেছিলেন। সম্প্রতি মুসৌরী হইতে বাড়ী ফিরিবার পথে অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়ায় কাশীতেই নামিতে বাধ্য হন।…গতকল্য সন্ধ্যায় অসুস্থ অবস্থাতেই তিনি টেলিফোন-যোগে কলিকাতাস্থ কোনও বন্ধুর সহিত কথা কহিতেছিলেন, সেই সময়ে সহসা উত্তেজিত হইয়া ওঠায় হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যায়। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স মাত্র ৩৫ বৎসর হইয়াছিল। ইত্যাদি…………………………

---

*এই গল্পের শেষ অংশে বিদেশী-গল্পের আভাস আছে।

মরণের পরেও

মৃত্যু-পথ-যাত্রিণীকে কে আর কটু কথা বলতে চায় ? তবু যে অমরেশের মুখ দিয়ে কথাগুলো বেরিয়ে গেল, সে অনেক দুঃখেই।

আজ ছ'মাস শুয়ে আছে সুহাসিনী, কঠিন রোগ—কিন্তু তাতেও কি স্বভাবের এতটুকু পরিবর্তন হয়েছে ? বিয়ের পর এই দীর্ঘ আটটা বছর অমরেশের কেটেছে যেন একটানা একটা দুঃস্বপ্নের মধ্য দিয়ে। একটু বেশি বয়সেই বিয়ে করেছিল অমরেশ, সে বয়সে রোম্যান্সের লোভে মানুষ ততটা বিয়ে করে না, যতটা করে গৃহে শান্তি, শৃঙ্খলা এবং একটু সেবার লোভে। তবু ফুলশয্যার রাত্রে নবোঢ়া বধূর সঙ্গে প্রথম পরিচয়—মন কিছু স্বপ্ন দেখেছিল বৈ কি ! কিন্তু সে স্বপ্ন ভাঙতেও বেশি দেরি হয়নি। সামান্য দু'একটা কথার পরই—অপরিচয়ের অন্তরাল দূর হওয়ামাত্র সুহাসিনী জানতে চেয়েছিল যে বিবাহের আগে অমরেশ কী পরিমাণ প্রেম করে বেড়িয়েছিল আর কতগুলি মেয়ের সঙ্গে ?

সেই সূত্রপাত—কিন্তু শেষ নয়।

প্রশ্নটার উত্তর পেয়ে পেয়ে সুহাসিনীর তৃপ্তি হয়নি—অর্থাৎ সংশয় যায়নি। অমরেশও ডাগর মেয়ে বিয়ে করেছিল—এ প্রশ্ন, এ সংশয় তার মনেও জাগতে পারে, সে কথাটা কিন্তু সুহাসিনী একবারও ভাবেনি। যেন তা অসম্ভব, সুহাসিনী সমস্ত সংশয়ের ঊর্ধ্বে—সিজারের পত্নীর মত। অথচ তারপর থেকে একদিনও অমরেশকে সে শান্তি

দেয়নি। 'ওদিকে চেয়েছিলে কেন, ওদের বাড়ীর সেই ধিঙ্গি অসভ্য মেয়েটা বুঝি জানলায় ছিল ?···অতই বা ঠাকুরঝির বাড়ী যাওয়া কেন ? ওর ননদ বুড়ীকে দেখে বুঝি আর আশ মেটে না ?...এতক্ষণ কোথায় ছিলে ? অফিসে ত তোমাদের ছুটি হয় পাঁচটায়—তুমি নটা পর্যন্ত অফিসে ছিলে ? কাকে বোকা বোঝাও বল ত ? আমি যেন কিছু বুঝি না ! আজ আবার এত দেরী কেন ? আজ ত অফিস নেই ? বায়স্কোপে গিয়েছিলে ? তা ত যাবেই। আমাকে নিয়ে যেতেই তোমার সময় নষ্ট হয় !...কী বললে ? বন্ধুরা জোর করে নিয়ে গিয়েছিল ? কে বন্ধু ? সমর সেন নিশ্চয় ? বেবিটা সঙ্গে ছিল ত ? আর বলতে হবে না। সেইজন্যে এত দেরি। সাড়ে আটটায় শো ভাঙ্গে, বাড়ী ফিরলে রাত সাড়ে নটায়। তারপর ? কতগুলি টাকা বেবির পেছনে খরচ হ'ল ?...বাজারে গিয়েছ সেই কখন ? একঘণ্টা ধরে বাজার ? না অমনি যাবার পথে আরতিদের বাড়ী চা খেয়ে যাওয়া হ'ল ?' ইত্যাদি। সহস্র প্রশ্নের মধ্যে কয়েকটি তুলে দিলুম। বেশি বলার প্রয়োজন নেই—পাঠকদের অনেকেরই এসব প্রশ্নের সঙ্গে পরিচয় আছে, নিজের 'মনের মাধুরী মিশায়ে' বাকীগুলো তৈরী ক'রে নেবেন।

তবে শুধু যদি প্রশ্ন হ'ত ত অত ভাববার ছিল না। ঝি চার মাসের বেশি রাখবার উপায় নেই। যেমন করেই হোক তাড়াবে সুহাসিনী। তা কে জানে যুবতী, কে জানে প্রৌঢ়া। ঘরের জানালা খোলা প্রায় বন্ধ করতে হয়েছিল, সুখের চেয়ে সোয়াস্তি ভাল। আর প্রতিবাদ করা বৃথা—মান-অভিমান কান্নাকাটি উপবাস—এসব অস্ত্র সুহাসিনীর তূণে যেন

জোগানো। সুতরাং সব আশাই অমরেশ বিসর্জন দিয়েছিল। অশান্তির ভয়ে তার মানসিক অবস্থা এমন হয়েছিল যে বাস করবার মত একটা কুয়া পেলেও সে বেঁচে যেত !

তারপর এই অসুখ ঃ এ আরও অসহ্য। কোন কাজ নেই, শুয়ে শুয়ে শুধু স্বামীকে সন্দেহ করা ছাড়া। সেবা করার জন্যে যে কোন আত্মীয়াকেই আনায়, তার সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে বসে সুহাসিনী। পথ্য না খাওয়া, ওষুধ না খাওয়া---এ ত অমোঘ অস্ত্র। শুধু পাগল হয়ে যেতে বাকী ছিল অমরেশের। ইদানীং সে সমস্ত মনে-প্রাণে প্রতীক্ষা করত স্ত্রীর মৃত্যুর---যদিও প্রার্থনা করতে তার সংস্কারে বাধত। মনের কাছে সে কিছুতেই স্বীকার করতে চাইত না যে সে স্ত্রীর মৃত্যুই চাইছে।

সবচেয়ে মজা এই---ওর এ মনোভাব সুহাসিনী জানত। প্রায়ই বলত, 'ওগো আর দেরী নেই---আমি মলে যে তোমার শান্তি হয় তা আমিও জানি। আর কটা দিন ? হয়ে এল। এতদিন পারলে আর কটা দিন ধৈর্য ধরে থাকো...আমার শেষ হয়ে এসেছে---'

আবার পরক্ষণেই হয়ত বলত, 'আমার ত হয়ে এসেছে। যাই---তারপর যত খুশি মজা লুটো। তখন ত আর বলতে আসব না। এই ক-টা দিন আর সহ্য হচ্ছে না। এত তাড়া!' সেদিনও কথাটা উঠেছিল এই প্রসঙ্গেই। কেউ নেই সেবা করার, অমরেশেরও আর অফিস কামাই করা সম্ভব নয়---সে প্রস্তাব করেছিল একটা নার্স রাখার। সুহাসিনী যেন জ্বলে উঠেছিল একেবারে---'হ্যাঁ---তার কম আর নেশা জমবে কেন। আমি এ ঘরে শুষব আর উনি পাশের ঘরে নার্সকে নিয়ে

ফুর্তি করবেন! আর হয়ত বড় জোর মাসখানেক আছি, তাও তোমার সহ্য হচ্ছে না? দগ্ধে দগ্ধে না মারলে আর চলছে না বুঝি? উঃ, কী পিশাচ তুমি, মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা দিতে একটু মায়া হয় না?...মরবার পর যা করবে তুমি তা ত বুঝতেই পারছি---শেষ কটা দিন একটু শান্তিতে থাকতে দাও!'

এতটা বলার পরিশ্রমেই তার শ্বাস আট্‌কে আসছিল। কোনমতে দম নিয়ে বলেছিল, 'তবে তাও বলে রাখছি, মনে করো না যে আমি মরে তোমাকে অব্যাহতি দেব। সারা জীবন জ্বালিয়েছ মরে তার শোধ তুলব। আবার জন্মাব, তোমার কাছে-কাছেই জন্মাব---ছায়ার মত লেগে থাকব সঙ্গে---যা খুশি তাই করবে তা হ'তে দেব না!'

অতখানি স্বার্থত্যাগের পর এতটা অকৃতজ্ঞতা পেলে কার মাথার ঠিক থাকে? অমরেশও সামলাতে পারেনি---বলে ফেলেছিল, 'মরবার পর যদি জন্মাও ত মানুষ হয়ে আর জন্মাবে না---এটা ঠিক। কুকুর বেড়াল হয়েই জন্মাবে। কিংবা যে খল তুমি, সাপ হওয়াই বেশি সম্ভব!'

অদ্ভুত একটা দৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে চেয়ে সুহাসিনী বলেছিল, 'বেশ ত, তাই না হয় জন্মাব। কিন্তু তাতেই কি রেহাই পাবে ভেবেছ? দেখে নিও!'

কিন্তু এসব ত কথার কথা। মনে করে রাখবার কথাও নয়, কেউ মনে ক'রে রাখেওনি।

কথাটা বলার দিন-আষ্টেকের মধ্যেই সুহাসিনীর মৃত্যু হয়েছিল। স্বস্তির নিঃশ্বাস, মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলে বেঁচেছিল অমরেশ ঠিকই---তবু একটু দুঃখও হয়েছিল স্ত্রীর জন্য। বেচারী!...ও-ই কি অশান্তি কম পেলে! চির-জীবন যে

ঈর্ষার আগুন অমরেশকে ঘিরেছিল তা কি ওকেও দগ্ধ করেনি? জীবনে শান্তি যে কেমন তা ত অনুভবই করতে পারলে না কখনও। আর এই অসময়ে—যে স্বামীকে একটি দণ্ডও চোখের আড়ালে রেখে স্বস্তি পেত না—তাকেই চিরকালের মত ত্যাগ করে চলে যেতে হ'ল!

আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবরা প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আবার বিয়ের প্রস্তাবটা এনেছিলেন। সত্যিই—এমন কিছু বয়স হয়নি। চল্লিশ-একচল্লিশ বছরে আজকাল অনেকেই প্রথম বিয়ে করে। ঘরেও ত লোক চাই একটা—শুধু চাকর-বাকরের ভরসায় কিছু এখন থেকে থাকা যায় না। বলতে গেলে সারা জীবনটাই ত পড়ে আছে!

কিন্তু অমরেশ কারুর কোন কথাই শোনেনি। বাবা, আবার! অনেক কষ্টে রেহাই পেয়েছে সে—মুক্তির আনন্দে সে যেন পাগল হয়ে উঠেছে। শুধু যখন খুশি এবং যত খুশি বাইরে ঘোরা, আর যত রাত্রে ইচ্ছা বাড়ী ফেরার মধ্যে যে এত আনন্দ আছে, কে জানত! একবারেই যথেষ্ট শিক্ষা হয়ে গেছে তার—আর দরকার নেই, ধন্যবাদ! খাওয়া-দাওয়া? তার জন্য হোটেল আছে। অসুখ-বিসুখ? হাসপাতালের অভাব কি? না হয় পেভ্‌মেণ্ট ত কেউ ঘোচায়নি? মরবার পরের কথা সে ভাবে না—যেখানে মরবে তারাই গন্ধ হবার ভয়ে যেমন ক'রে হোক সরাবার ব্যবস্থা করবে।

তবে এ ত প্রথম আনন্দের উন্মত্ততা! এ কেউ বিশ্বাস করেনি। শুধু এইটে বুঝেছিল যে আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে।

বছর খানেক পরে পূজার সময় বেশি ছুটি নিয়ে রাজগীরে গেল অমরেশ। সেখানে ঠিক ওর পাশের বাংলোতে যিনি ভাড়া ছিলেন সেই শুভ্রাংশুবাবুর সঙ্গে হঠাৎ খুব ভাব জমে গেল। ওরা একসঙ্গে কুণ্ডে স্নান করতে যায়—অত ভোরে এবং অত রাত্রে আর কেউ যেতে চায় না। দু'জনের রুচির সঙ্গে দুজনের মিল হওয়াতে ক্রমে অন্তরঙ্গতাটা বেড়ে গেল। শুভ্রাংশুবাবুর চব্বিশ প'চিশ বছরের অনূঢ়া ভগ্নীটির সঙ্গেও পরিচয় হ'তে যে বিলম্ব হ'ল না, তা বলাই বাহুল্য। এবং সেই ভগ্নীটি, রুচিরা তার নাম---শিগ্‌গিরই আবিষ্কার করলে যে একটি বাচ্ছা চাকরের ওপর অমরেশের গৃহস্থালীর ভার। সে রান্না করে অখাদ্য, চা করে জলের মত এবং কোন কাজটাই ভাল ক'রে করতে পারে না।

ফলে প্রত্যহই একটা দুটো ব্যঞ্জন ও বাংলো থেকে এ-বাংলোতে এসে পেঁছতে লাগল। সকালে দুপুরে বিকেলে এবং সন্ধ্যায়---চায়ের কাপ নিয়ে রুচিরা নিজেই আস্‌ত। একদিন দুদিন ছাড়া ও বাংলোতেই আহারের নিমন্ত্রণ হ'তে লাগল এবং কয়েকদিন পর থেকেই অমরেশ দেখলে ওর ঘরকন্না ও শয্যার বিশৃঙ্খলা ঘুচে গেছে। কে যেন ওর অনুপস্থিতিতে এসে তার মায়া-হস্ত বুলিয়ে সব কিছু সুন্দর ক'রে গুছিয়ে রেখে যায়।

ঋষিরা একেই বোধ হয় মহামায়ার ফাঁদ বলেছেন। অমরেশের অত তিক্ত অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও আবার রুচিরাকে নিয়ে গৃহস্থালী পাতবার কথাটা ভাবতে লাগল। শুভ্রাংশু একদিন বলেও ফেললে কথাটা, 'এমন করে আর কতদিন চলবে অমরেশ-বাবু, আর একবার সংসার পাতুন। দেখুন বলেন ত---আমরা

ত আপনাদেরই পাল্‌টি ঘর, রুচিরাও কিছু খারাপ মেয়ে নয়। লেখাপড়াও কিছু জানে, গৃহস্থালীর কাজ যেটা আপনার বেশি দরকার, সেটার সার্টিফিকেট ওকে বোধহয় আপনিই দিতে পারবেন---'

অমরেশ আর না বলতে পারলে না। বললে, 'সে দেখুন। আগে আপনার ভগ্নীর মত নিন---আমার মত প্রৌঢ়কে---অবিশ্যি একটা বাড়ীও আছে কলকাতায়, মোটা মাইনের চাকরীও করি---তবু আমাকে ওর পছন্দ হবে কি ?'

'বিলক্ষণ ! ঐ কি আর কচি খুকী ?'

কথাটা রাত্রে কুণ্ড থেকে ফেরবার পথে হয়েছিল। অন্ধকার নির্জন রাস্তা তার মোহ বিস্তার করেছিল রুচিরার চিন্তাকে ঘিরে। অমরেশ লঘুমনেই বাসায় ফিরল। ঘরে ফিরে দেখলে শয্যাটি পরিপাটি সাজানো। কাপড় জামা গুছিয়ে কিছু বাক্সয়, কিছু আলনায় তোলা হয়েছে। আলোটি পরিষ্কার ঝক্‌ঝক্‌ করছে। তৃপ্তি ও কৃতজ্ঞতায় মন ভরে গেল। তিক্ত অভিজ্ঞতার আশঙ্কা বহুদূরে চলে গেল। রাত্রে খাওয়ার আগে ও-বাড়ী থেকে মাংস এবং মিষ্টান্ন এসে পেঁছিতে আরও ভাল লাগল। এমনি জীবন-সঙ্গিনীই ত মানুষের কাম্য---অমরেশও ত তাই চেয়েছিল।

খেতে বসে সবে এক গাল মাত্র রুটি মাংসর ঝোলে ডুবিয়ে মুখে পুরেছে অমরেশ---তার স্বাদ ও গন্ধ সমস্ত অনুভূতিকে অধিকতর লালায়িত করে তুলেছে মাত্র---এমন সময়ে অকস্মাৎ একটা প্রকাণ্ড বন বেড়াল ও-পাশের জানলা দিয়ে লাফিয়ে পড়ল, একেবারে মাংসর বাটিটার ওপর—বাটিটা উল্‌টে মাংসও যেমন পড়ে গেল, ফেরবার পথে মিষ্টান্নের প্লেট্‌টাও ভেঙ্গে

খান্ খান্ হয়ে গেল ওর পায়ের আঘাতে।

হৈ-হৈ করে উঠল ওর চাকর রাজু, অমরেশ নিজেও। কিন্তু ততক্ষণে অনিষ্ট যা হবার তা হয়েই গেছে। চোখের নিমেষে যেন ঘটনাটা ঘটে গেল। রুচিরা আর তার বৌদিও ছুটে এল ও-বাড়ী থেকে—অমরেশের কোন নিষেধ না শুনে ওরা নতুন করে খাবার এনে দিলে—ব্যাপারটা তখনকার মত মিটেই গেল। রাজু বললে, 'বাপরে, বেড়ালটা যেন বাঘের মত, দেখেছেন বাবু ? দেখলে ভয় করে।'

রুচিরা বললে, 'আজ কদিনই দেখছি আমাদের বাড়ীর আনাচে-কানাচে ঘুরছে। অবশ্য আমাদের অনেক লোক থাকে বলে ঘরে ঢুকতে পায়নি। কী সাহস দেখেছেন ? পাত থেকে খেতে চায়—বেড়ালের এমন সাহস ত কখনও দেখিনি !'

রাত্রে শুয়ে কথাটা ভাবতে ভাবতেই অমরেশ ঘুমিয়ে পড়েছে। হঠাৎ কী একটা শব্দে ওর ঘুম ভেঙ্গে গেল। কৃষ্ণ-পক্ষের শেষ রাত্রির জ্যোৎস্না ঘরে এসে পড়েছে, তারই অস্পষ্ট আলোতে অমরেশ দেখলে সেই বেড়ালটা ওরই বিছানায় এসে বসেছে এবং ওর দিকে চেয়ে গলায় অদ্ভুত একটা শব্দ ক'রে গর্জন করছে। ঝগড়া করার সময় যেমন শব্দ বার হয় ওদের গলায়—তেমনি।

দৃশ্যটা এমন অচিন্তিতপূর্ব, এমন অবাস্তব যে দেখামাত্র ভয়ে চীৎকার করে উঠল অমরেশ। সেই চীৎকারেই বোধ হয় ভয় পেয়ে বেড়ালটা পালাল। রাজু ঘুম ভেঙ্গে লাফিয়ে উঠল 'কী কী বাবু, কী হয়েছে ?'

কিন্তু সে উত্তর অমরেশকে আর দিতে হ'ল না—তার আগেই পাশের বাড়ীতে নারীকণ্ঠের একটা আর্ত চীৎকার !

এরা ছুটে গিয়ে শুনলে, সেই বেড়ালটাই ঘুমের মধ্যে রুচিরাকে আঁচড়ে দিয়ে গেছে।—

মৃত্যু-পথ-যাত্রিণীর এক অদ্ভুত দৃষ্টি ভেসে উঠল অমরেশের মানসপটে। কপাল ঘামে ভরে গেল। হাত দিয়ে সে ঘাম মুছতে গিয়ে দেখলে হাত কাঁপছে থর্ থর্ ক'রে।

অমরেশ আর একদিনও রাজগীরে রইল না। শুভ্রাংশুকে জানালে, জরুরী কাজ পড়েছে একটা—টেলিগ্রাম এসেছে। ওকে যেতেই হবে। এই সকাল এগারোটার গাড়ীতেই।

শুভ্রাংশু ব্যাকুল হয়ে বললে, 'কিন্তু এমন অকস্মাৎ—এমনভাবে—অনেক কথা রয়ে গেল অমরেশবাবু। এধারের—'

'গিয়েই চিঠি দেব আপনাকে। বিচলিত হবেন না। আবার হয়ত ঘুরে আস্‌তে পারি। কিন্তু আজ আমার মন বড় বিক্ষিপ্ত। আজ আর কিছু বলতে পারছি না। মাপ করবেন।'

শুভ্রাংশু আর কিছু বললে না। শুধু তার স্ত্রী বললে, 'আচ্ছা টেলিগ্রাম এল কখন? ভদ্রলোক বেড়ালের ভয়েই পালাচ্ছেন না কি?'

রুচিরা রাগ করে বললে, 'বৌদি যেন কি! আমরা কি সবাই পথের দিকে চেয়ে বসে আছি? যে কখন কার কি টেলিগ্রাম আসছে খবর রাখব।'

বৌদি মুখ টিপে হেসে বললেন, 'তা বটে ভাই—আমারই অন্যায় হয়েছে।'

ট্রেন যায় একেবারে ওদের বাংলোর সামনে দিয়ে। অমরেশ খুব নিরুৎসাহ বিষণ্ণমুখে রুমাল নাড়লে, রুচিরার ছলো-ছলো চোখ দূর থেকেও ওর দৃষ্টি এড়ায়নি। ট্রেনখানা

চলে যেতে অপাঙ্গে ভগ্নীর মুখের দিকে চেয়ে শুভ্রাংশু বললে, 'এ আবার এক ফ্যাসাদ বাধল !'

কিন্তু কলকাতায় ফিরল না অমরেশ। গভীর রাত্রেই মধুপুরে নেমে পড়ল। কালীপুর টাউনে ওর এক বন্ধুর বাড়ী আছে। বহুবার অমরেশ এসে থেকে গেছে, মালী ওকে ভাল করেই চেনে—থাকবার কোন অসুবিধা হবে না।

তাই বলে অত রাত্রে ত আর সেখানে যাওয়া যায় না। প্ল্যাটফর্মের এক প্রান্তে মালগুলো জড়ো ক'রে রেখে তাইতে ঠেস্ দিয়ে রাজু ঘুমোতে লাগল, অমরেশের চোখে কিন্তু ঘুম এলো না। সে সেই নিস্তব্ধ প্ল্যাটফর্মেই পায়চারী করতে লাগল।

কত ট্রেন এল, কত ট্রেন গেল। যখন ট্রেন আসে যাত্রীদের গোলমাল, কুলীদের বিবাদ—ভেন্ডারদের উচ্চকণ্ঠ---সবটা মিলে যে কোলাহল হয়, ষ্টেশনে যে প্রাণলক্ষণ জাগে তাতে খানিকটা অন্যমনস্ক হয় অমরেশ, আবার ষ্টেশনের আলো স্তিমিত হয়ে আসে এক সময়ে---কোলাহল যায় স্তব্ধ হয়ে, ওর মনও ফিরে আসে নিজের দুর্ভাগ্যে।

কথাটা ভাবছে অমরেশ। সারাদিন ধরেই ভাবছে।

এ কী হ'ল ওর! শুধু কি ওর ভাগ্যেই যত অঘটন ঘটে। আট বৎসরের বিবাহিত জীবনে একদিনের জন্যও শান্তি দেয়নি সুহাসিনী, মরবার পরও নিষ্কৃতি দেবে না ? এ কী বিদ্বেষ তার, কি অসম্ভব ঈর্ষা !

কিন্তু পূর্ব দিগন্তে ঊষার স্বর্ণাভাস জাগার সঙ্গে সঙ্গেই যেন মনের মধ্যে আশ্বাস পায় একটা ! চিন্তাটা সেই শেষ

রাত্রিতে প্রথম মাথায় এসেছিল—আর ওকে ত্যাগ করেনি। এতক্ষণ ধরে যা কিছু ভেবেছে, চিন্তাটাকে মনে মনে মেনে নিয়েই ভেবেছে। কিন্তু এখন এই প্রত্যুষে একটা সংশয়ও ক্রমে দেখা দিল---সবটাই কাকতালীয় নয়ত ? ওটা হয়ত সাধারণ বেড়াল একটা, বুনো বেড়াল। অমরেশের উত্তপ্ত কল্পনাই তাকে সুহাসিনীর স্মৃতির সঙ্গে জড়িত করেছে !

না---কাজটা অন্যায় হয়ে গেছে।

সামান্য একটা বুনো বেড়ালের ভয়ে চলে এল সে। এই আধুনিক যুগের সভ্য মানুষ !

পায়চারী থামিয়ে জোর ক'রে যেন নিজের মনে বল আনে অমরেশ। রাজুকে ডাকে, 'এই রাজু ওঠ্, দ্যাখ দিকি, একটা এক্কা কিংবা রিক্সা ! চল্ যাই !'

কালীপুর টাউনে যখন পৌঁছল তখন বেশ ফরসা হয়ে গেছে। মালী ওকে দেখে খুশি হয়েই সেলাম করলে, ফটক খুলে তাড়াতাড়ি মালটালগুলো নামিয়ে নিলে।

'বাবু সেই ঘরে থাকবেন ত ? পূবদিকের ঘরটায় ? ঐটে ত আপনার ভারি পছন্দ !'

'হ্যাঁ---বাপু, ঐ ঘরটাই আমাকে খুলে দাও !'

বাগানে শিউলি ফুল ফুটে আছে অজস্র। তার সঙ্গে এখনও জড়িয়ে আছে অসংখ্য রজনীগন্ধার সুবাসের স্মৃতি। হিমেল ভোরাই হাওয়ার সঙ্গে সেই মিষ্টি গন্ধ মিশে রাত্রি-জাগরণ-ক্লান্ত চিন্তাক্লিষ্ট অমরেশের সর্বাঙ্গ জুড়িয়ে গেল।

'আঃ।' আপনার মনেই বলে ওঠে ও।

মালী কোমর থেকে চাবির গোছাটা হাতে ক'রে এগিয়ে যায় দোর খুলতে। পিছনেই অমরেশ, তার পিছনে বিছানা

ও স্যুটকেস নিয়ে রাজু। ঘরটা বন্ধ আছে...দোর জানলা সব বন্ধ। বোধহয় দীর্ঘকাল ধরেই বন্ধ রয়েছে এমনি, দোর জানলা খুলে দেবার পর খানিকটা বাইরের বাতাস ঢোক্‌বার আগে আর ওর মধ্যে যাওয়া যাবে না...মনে মনে ভাবে অমরেশ। কিন্তু হঠাৎ ওর চমক ভেঙ্গে যায় মালীর আতঙ্ক-কণ্টকিত অস্ফুট আর্তনাদে। তীক্ষ্ণকণ্ঠে সে প্রশ্ন করে, 'কী হ'ল মালি ?'

সঙ্গে সঙ্গেই এগিয়ে আসে খানিকটা।

ও কি ?

ওরও গলা থেকে একটা আর্তস্বর বেরোয়। ঘরের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড কালো কুকুর...ঈষৎ শীর্ণ হয়ত, জিভ বার ক'রে হাঁপাচ্ছে এবং কেমন এক রকম জ্বলন্ত দৃষ্টি মেলে ওদের দিকে চেয়ে আছে !

খানিকটা চেয়ে থাকার পর ওদের পাশ কাটিয়ে দৌড়ে বেরিয়ে গেল কুকুরটা।

মালীর চোখ দুটো বিস্ফারিত, ভয়ে হাত-পা কাঁপছে!

'কোথা থেকে এল বাবু কুকুরটা ? দোর-জানলা সব বন্ধ !'

অমরেশেরও বুকের মধ্যেটা হিম হয়ে এসেছিল। কিন্তু তবু সে কন্ঠস্বরে জোর দিয়ে বললে, 'ঐ যে—নর্দমা।'

খোলা নর্দমা একটা আছে ঠিকই—তবে তার মধ্যে দিয়ে অতবড় কুকুর আসা কি সম্ভব ? মালী সংশয় প্রকাশ করে।

'কবে খুলেছিলে ঘরটা শেষ ? সেই সময় হয়ত ঢুকে বসেছিল?'

'খুলেছিলুম ? সে ত মাসখানেক আগে। তবে হ্যাঁ— পরশু দু'খানা কাগজের দরকার হয়েছিল তাই একবার খুলেছিলুম। ঐ যে তাকের ওপর পুরোনো খবরের কাগজগুলো আছে, সেই আপনি যখন ছিলেন সেই সময় থেকে কাগজগুলো পড়ে আছে ওখানে। কিন্তু সে ত এক মিনিট বাবু !'

'সেই সময়ই কখন ঢুকে পড়েছে হয়ত, আর বেরোতে পারেনি।'

'কিংবা নর্দমা দিয়েই ঢুকেছে। ঢোকে ওরা এক রকম ক'রে—বেরোতে পারে না আর।' বিজ্ঞভাবে বলে রাজু।

দুপুরে ক্লান্ত চোখ বুজে আসে, তবু ভাল ক'রে ঘুম হয় না। রুচিরার ছলোছলো দুটি চোখের স্মৃতি, তার সঙ্গে আলো-আঁধারিতে একটা বন বেড়ালের প্রকাণ্ড রুষ্ট মুখ, সুহাসিনীর ঈর্ষাকুটিলদৃষ্টি—সবটা যেন স্বপ্নের মধ্যেও তালগোল পাকায়।

অবশেষে বিকেলবেলা বাগানে বসে চা খেতে খেতে মন স্থির ক'রে ফেলে অমরেশ।

ভাগ্যের সঙ্গে লড়েই দেখবে সে। সে ত কোন পাপ করেনি কোনদিন, তবে এ শাস্তি কেন তার ? কেন সহ্য করবে সে এ পীড়ন ? বিনা দোষে চরম কোন দণ্ড নিশ্চয়ই বিধাতা তাকে দেবেন না !

সে তখনই বসে শুভ্রাংশুকে একটা চিঠি লিখে দিলে, যদি ওঁদের কোন আপত্তি না থাকে, এবং রুচিরার মত হয় ত—এ বিবাহ সে সৌভাগ্য বলেই মনে করবে। আগামী অগ্রহায়ণেই তাহ'লে হ'তে পারবে শুভ কাজ। এখন এই কার্ত্তিক মাসের

কটা দিন অমরেশ মধুপুরে থাকবে। কলকাতার ঠিকানাও লিখে দিলে সে।

চিঠিখানা খামে এঁটে রাজুকে ষ্টেশানে পাঠিয়ে দিলে ওখানের ডাক বাক্সে ফেলে দিয়ে আসতে। তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে একখানা বিলিতী নভেলে মন দিলে।

দিন তিনেক পরেই শুভ্রাংশুর চিঠি এল।

"আপনার পত্র পেয়ে সত্যিই খুশি হলুম কিন্তু এধারে এক বিভ্রাট। রাজগীরে থাকা আর হ'ল না। কাল সন্ধ্যেবেলা বেড়িয়ে ফিরছি হঠাৎ অন্ধকারে রুচিরা বোধহয় ঘুমন্ত একটা কুকুরের গায়ে পা দেয়। সে উঠেই ওকে কাম্‌ড়ে দিয়েছে। এখানে ত একটিই মাত্র ডাক্তার, তিনি অবশ্য যা করবার সবই করেছেন কিন্তু তবু মনে হয় কলকাতায় নিয়ে গিয়ে ইঞ্জেকশ্যন্‌গুলো সেরে ফেলাই ভালো। কারণ কুকুরটার আর কোন হদিশ পাইনি। ক্ষ্যাপা কিনা কে জানে ? মনে করছি কাল এখান থেকে বাস-এ গিয়ে টুয়েল্‌ভ্‌ ডাউন ধরব। কলকাতায় গিয়ে দেখা হবে। আপনি কবে আসবেন ?'

দৃষ্টি কঠিন হয়ে এল অমরেশের। ভয় হচ্ছে ঠিকই—অজ্ঞাত একটা আতঙ্ক। মনে হচ্ছে যে তার এই দুর্ভাগ্যের সঙ্গে রুচিরাকে জড়ানো হয়ত ঠিক হচ্ছে না। বিনা দোষে তার যদি কোন ক্ষতি হয়—সত্যি-সত্যিই ? আবার সঙ্গে সঙ্গেই মনে হচ্ছে সে-ও ত বিনা দোষেই সইছে এত নির্যাতন। তবে সে কেন রুচিরার জন্য চিন্তা করবে ? স্বার্থপরই হবে সে। এত দুঃখের পর এতখানি সৌভাগ্যের সুযোগ যদি বা এসেছে হাতের কাছে এগিয়ে—কোনমতেই তাকে সে ছাড়বে না।

প্রাণপণ করেই লড়বে অদৃষ্টের সঙ্গে—প্রয়োজন হ'লে পণ রাখবে তার এবং রুচিরার—দু'জনেরই প্রাণ। ক্ষতি কি ?

গভীর রাত্রে টুয়েল্‌ভ্‌ ডাউন মধুপুরে এল। তবু ওদের খুঁজে বার করতে কষ্ট হ'ল না। কোন অজ্ঞাত কারণে রুচিরার ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল এখানে এসেই—মুখ বাড়িয়ে সে অন্ধকার মধুপুর শহরের দিকে চেয়েছিল।

অমরেশ আসাতে বাকী সকলেও জেগে উঠল। বৌদি হেসে বললেন, 'এত রাত্রে ষ্টেশনে এসেছেন ঠাকুরঝিকে দেখতে। একেই বলে টান।'

অপ্রতিভ হয়ে অমরেশ কতকগুলো জবাবদিহি করতে গেল...ফলে আরও অপ্রস্তুত হ'তে হ'ল। রুচিরাও হয়ে উঠল লাল। তবে সকলেই যে খুশি হ'ল তাতে সন্দেহ নেই।

শুভ্রাংশু বললে, 'উঠে পড়ুন না—একসঙ্গেই যাওয়া যাক।'

'না—না, মালপত্র রয়েছে তা ছাড়া বাচ্ছা চাকর ভয় পাবে।'

গাড়ী চলে গেল। ছাড়ার আগে ওর ভেতরই এক ফাঁকে রুচিরা হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল, অমরেশ সেই দুর্লভ হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে ধরে চাপ দিয়েছে একটু। মনটা ভারি খুশি আছে। শীষ দিতে দিতে ফিরল অমরেশ।

রিক্সা থেকে নেমে মালীকে ডাকতেই সে দোর খুলে দিলে। রাজুকে ডেকে দিলে সে-ই। বাল্‌তিতে জল রাখা ছিল, বেশ করে হাত-পা ধুয়ে মুখে ঘাড়ে জল দিয়ে ঘরে এসে ঢুকল অমরেশ। রাজু আবার ঘুমিয়ে পড়েছে, হ্যারিকেন জ্বলছে মিট্‌মিট্‌ ক'রে—খুব কমানো, তাতে আলোর একটা আভাস মাত্র পাওয়া যায়। রাজুর জন্যই এ আলোটা সারারাত

জ্বলে, ওরও কেমন একটা ভয় হয়েছে, একেবারে অন্ধকারে মেঝেতে শুতে ভরসা করে না।

মাথা মুখ তোয়ালেতে মুছতে মুছতে বিছানায় এসে বসল অমরেশ। আর মাত্র ঘণ্টা-দুই রাত আছে। এখন শুলে ঘুম আসতে আসতেই ভোর হয়ে যাবে। শোবে ? না বই পড়বে। মনটা বহুদিন পরে বড় প্রফুল্ল...খুশির একটা জোয়ার এসেছে মনে। সেজন্য ঘুমের ইচ্ছা খুব নেই। রাত্রি জাগরণের কোন অবসাদও টের পাচ্ছে না।

ভাবতে ভাবতে চোখটা পড়েছে ওর মাথার বালিশের দিকে। আবছায়া আলো...তবু, তবু মনে হচ্ছে বালিশের খাঁজের ছায়াটা যেন একটু বেশি গাঢ় নয় ?

মুহূর্ত-মধ্যে সমস্ত চৈতন্য তীক্ষ্ন, সজাগ হয়ে উঠেছে। ভাল ক'রে তাকিয়ে দেখলে। তারপর আলোটা বাড়িয়ে লণ্ঠনটা এনে ধরলে। হ্যাঁ—ঐ ত ! বালিশের খাঁজে ছায়ার সঙ্গে মিলিয়ে রয়েছে কালো রঙের সরু লিকলিকে একটি সাপ।

অসহ্য ক্রোধে অমরেশ যেন দিগ্বিদিক-জ্ঞানশূন্য হয়ে উঠল নিমেষের মধ্যে। সে ক্রোধ তার অদৃষ্টের ওপর, সে ক্রোধ সুহাসিনীর ওপর—

এদিক ওদিক চাইতেই নজরে পড়ল মোটা একটা বাঁশের লাঠি কোণে ঠেসানো রয়েছে। সে সেই লাঠিটা তুলে নিলে।

সাপটাও ততক্ষণে সজাগ হয়ে উঠেছে।

লাঠি নিয়ে অমরেশ কাছে আসতেই বিছানা থেকে সড়াৎ করে লাফিয়ে নিচে পড়েছে সে। নিচেই বেচারী রাজু শুয়ে আছে। কিন্তু অমরেশ কার্যক্ষেত্রে যথেষ্ট ক্ষিপ্র হ'তে পারে—

এখনও। সে যেন বিদ্যুৎ বেগেই লাঠিটা বসিয়ে দিলে সাপের মাথায়।

ছোট সরু সাপ...লাঠিটাও বেশ মোটা।

সাপের মাথাটা থেঁতলে চ্যাপ্টা হয়ে গেছে। মৃত্যু যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করছে সে, সমস্ত দেহটা অসহায় ভাবে বেঁকে চুরে উঠ্‌ছে বারবার।

রাজু লাঠির শব্দে জেগে উঠে ঐ দৃশ্য দেখে চীৎকার ক'রে উঠেছে। মালী এসেছে ছুটে। কিন্তু অমরেশের কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। সে কেমন যেন স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে সেই সাপটার মৃত্যু-যন্ত্রণা দেখছে। চোখ ফেরাতে পারছে না... এমনি একটা অমোঘ আকর্ষণে ওর দৃষ্টি তাতে নিবদ্ধ।

আনন্দ হয়েছে ওর ? নিশ্চিন্ত হয়েছে !

তা অমরেশও জানে না। ওর অনুভূতিও যেন জড় হয়ে গেছে। প্রথমের সেই অসহ্য ক্রোধ আর নেই, বরং এই জিঘাংসার জন্য যেন নিজের কাছেই সে লজ্জিত ; তবু তাকিয়েই আছে সে।

সাপটা ছট্‌ফট্ করতে করতেই খানিকটা এগিয়েছে... দোরের দিকে। রাজু আর এক ঘা মারতে যাচ্ছিল...অমরেশ ইঙ্গিতে নিষেধ করলে।

মুখ-হাত ধুয়ে যখন প্রথম ঘরের ভেতর পা দেয় অমরেশ তার তখনকার সেই পায়ের সজল ছাপটা এখনও শুকোয়নি। একটু বেশি জলই ছিল বোধহয় পায়ে...পরিপূর্ণ ছাপটা যথেষ্ট জল নিয়ে স্পষ্ট হয়ে আছে মেঝের ওপর।

মরণাহত সাপটা তার পিষ্ট দলিত মুখটাকে কোনমতে যেন

বহন ক'রে এনে সেই জলের ছাপের ওপর এসে স্থির হয়ে গেল। এইবার বোধহয় মারাই গেল সে।...

হয়ত মৃত্যু-যন্ত্রণার অসহ্য তৃষ্ণাই তাকে টেনে এনেছিল এই সামান্য জল-রেখার দিকে। হয়ত সবটাই আকস্মিক যোগাযোগ মাত্র কিন্তু অমরেশের যেন মনে হ'ল অন্তিম মুহূর্তে সরীসৃপটা তার পদচিহ্নে পৌঁছে সমস্ত অপরাধের জন্য চরম ক্ষমা প্রার্থনা ক'রে গেল।

কে জানে কেন, আজ সে সুহাসিনীর জন্য দুঃখবোধ করলে।

বেচারী! সে নিজেও ত কখনও শান্তি পায়নি!

সবার অলক্ষ্যে চোখের কোণ দুটো মুছে অমরেশ আবার বিছানাতে গিয়েই বসল।

'বসবেন না, বসবেন না বাবু। ভাল ক'রে দেখে নিই আগে। আর কোথাও কিছু আছে কিনা।...এই হিমে যখন সাপ বেরিয়েছে...'

'নাঃ—আর ভয় নেই!' অমরেশ বেশ জোর দিয়েই বলে। এ জোর সে কোথায় পায়, কে জানে!

—শেষ—

এই লেখকের লেখা—

মনে ছিল আশা
প্রভাত সূর্য
রাত্রির তপস্যা
কাছে আছে যারা
রাত মোহানা
সীমান্ত রেখা
জ্যোতিষী
পুরুষ ও রমণী
স্ত্রিয়াশ্চরিত্রম
ভাড়াটে বাড়ী
স্বর্ণমুকুর
বহু বিচিত্র
নব যৌবন
দুর্ঘটনা
প্রেরণা
কমা ও সেমিকোলন
সাবালক
রজনীগন্ধা
কোলাহল
চতুর্দোলা
মিলনান্ত
নববধূ
স্মরণীয় দিন
দুটি
শ্রেষ্ঠ গল্প